ইসলামের দৃষ্টিতে বন্দীমুক্তি

ফজিলত, বিধিবিধান ও করণীয়



নাহি আল-হাসান

ইসলামের দৃষ্টিতে বন্দীমুক্তি

ফজিলত, বিধিবিধান ও করণীয়

নাহি আল-হাসান (عفا الله عنه)

ইসলামের দৃষ্টিতে বন্দীমুক্তি

ফজিলত, বিধিবিধান ও করণীয়

প্রকাশকাল: ৩৬ জুলাই, ২০২৫।

ইহদা

মাজলুম মুসলমানের অভিভাবক, শাইখুনা মুফতি **হারুন ইযহার** – হাফিজাহুল্লাহ- এর প্রতি।

মাজলুম আলেম ও উম্মাহদরদী দাঈ মাওলানা **আতাউর রহমান বিক্রমপুরী**, মাওলানা **আলতাফ হোসেইন**, মাওলানা **শফিকুল ইসলাম** – হাফিজাহুমুল্লাহ – এর প্রতি।

এবং উম্মাহপ্রেমী সকল দাঈর প্রতি, যারা বন্দীমুক্তির মহান কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন সময়, শ্রম ও জানমাল দিয়ে।

সূচিপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد

এক.

মহান আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্বজগত ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, উপকারী ও কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা ও ধর্ম হিসেবে 'ইসলাম'-কে মনোনীত করেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন—এমনকি মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান তিনি তাঁর মনোনীত দ্বীন 'ইসলাম'-এর মধ্যে রেখেছেন।

পূর্বযুগে রাজ্য ও অঞ্চলভিত্তিক শাসনব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ। ক্ষমতার মসনদ দখলের জন্য কিংবা নিজ সাম্রাজ্যের পরিধি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা ছিল। যুদ্ধে এক পক্ষ অপর পক্ষের যোদ্ধাদের হত্যা করবে, বন্দী করবে—এটিও ছিল স্বাভাবিক বিষয়।

কিন্তু বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে এক ধরণের অস্বাভাবিক ও অমানবিক ধারা ও ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়। এই বিকৃত ব্যবস্থার হিংস্র আক্রমণের প্রধান শিকার হয়েছে মুসলিম পরিচয়ে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। বিশেষ করে, তারা যারা মনেপ্রাণে ইসলামকে বিশ্বাস ও লালন করে।

দুই.

পূর্বে মুসলমানদেরকে যেভাবে কাফের রাষ্ট্র বা শাসকেরা বন্দী করে আটকে রাখত এবং তাদের উপর নির্যাতন চালাত, আজও তেমন নির্যাতন অব্যাহত আছে—তবে

এখন তা ঘটে তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্র বা নামধারী মুসলিম শাসকদের হাতে। বর্তমানে আসলী* কাফের রাষ্ট্র বা শাসকের চেয়ে নামমাত্র মুসলমান শাসক ও কথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নির্যাতন, নিপীড়ন ও দমন-পীড়নের মাত্রা আরও ভয়াবহ, দীর্ঘ এবং ব্যাপকতর।[1]

এর মধ্যে মিসর, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সিরিয়া, বাংলাদেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব দেশে নিরপরাধ মুসলমানদের প্রতি যে ধরণের অমানবিক নির্যাতন ও ভয়ংকর নিপীড়ন চালানো হয়, তা কল্পনাতীত। কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব না। আর যেহেতু এসব দেশের শাসক নামধারী মুসলমান অথবা উক্ত দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র, তাই এদের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান সেভাবে সতর্ক ও সচেতন নয়, যেমন কাফের রাষ্ট্রের ব্যাপারে তারা সচেতন। এই জিনিসটা এসব রাষ্ট্রের অনেক গুরুতর অপরাধ ও পাপকে মানুষের চোখে ‘লঘু’ বানিয়ে দিয়েছে। মূলত এসব কারণেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অবতারণা।

একইসাথে এ প্রশ্নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে—মুসলিম বন্দীদের প্রতি উম্মাহর দায়িত্ব কী? কাফের রাষ্ট্রে কিংবা নামধারী মুসলিম রাষ্ট্রে অন্যায়ভাবে বন্দী মুসলমানদের মুক্ত করার শরয়ী বিধান কী? কে তাদের মুক্ত করবে? কীভাবে করবে? কেন করতে হবে? এমন মৌলিক, জরুরি ও স্পষ্ট বিষয়গুলোর উপর বাংলা ভাষায় এখনও কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। এই ঘাটতি পূরণ ও এ দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকেই কলম হাতে নিতে হয়েছে।

---

* আসলী কাফের অর্থ হলো যে জন্মগতভাবে কাফের। অর্থাৎ তার পিতা-মাতা কাফের তাই সে কাফের।

[1] এখানে কাফের রাষ্ট্র কর্তৃক মুসলমানদের বন্দী করে তাদের উপর নির্যাতন করার বিষয়টা উপেক্ষা করা হচ্ছে না। বরং কথিত মুসলিম রাষ্ট্রের নির্যাতনের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা বুঝানো হচ্ছে।

তিন.

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে যেসব ঐতিহাসিক তথ্য ও বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে, প্রত্যেকটির সাথে যথাযথ সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি হাদিসের ক্ষেত্রেই মান উল্লেখসহ মূল গ্রন্থের রেফারেন্স সংযুক্ত করা হয়েছে। সহজলভ্যতা ও পাঠকের সহায়তার জন্য, কুতুবে সিত্তাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল গ্রন্থের রেফারেন্স 'মাকতাবাতুশ শামিলা' এর অনলাইন সংস্করণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বইটি মূলত সাধারণ মুসলমানদের জন্য রচিত। তাই ভাষা ও আলোচনা যথাসম্ভব সহজ, সাবলীল ও বোধগম্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই বই পাঠের মাধ্যমে পাঠক শরীয়াহর দৃষ্টিতে বন্দীমুক্তি সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা লাভ করবেন—যা তাকে এই মহান কাজ এবং উপেক্ষিত দায়িত্বে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে, ইনশাআল্লাহ।

একইসাথে, লেখক হিসেবে অন্তত এটুকু আশা রাখি যে, আল্লাহর দরবারে দায়মুক্ত হতে পারব—যেহেতু একজন হলেও এই অবহেলিত বিধান সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছে এবং তা স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছে। উক্ত লেখায় যা কিছু সত্য ও সঠিক সেগুলি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং যা ভুল ও বাতিল তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে।

হে আল্লাহ! এটি কেবলমাত্র আপনার জন্য। আপনিই উত্তম প্রতিদানদাতা। আপনি এটি কবুল করে নিন। এর বিনিময়ে আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে মাফ করে দিন। আমিন।

নাহি আল-হাসান (عفا الله عنه)

বাদ আসর, ৯ সফর, ১৪৪৭ হিজরী।

সুবাহ বাংলা।

বন্দী কাকে বলে?

বন্দী শব্দটির জন্য যেভাবে বাংলাতে অনেক শব্দ রয়েছে, আরবীতেও একাধিক শব্দ রয়েছে। যেমন - مقيَّد، معتَقَل، أخيذ، محبوس، العاني، مسجون، أسير ইত্যাদি।

বাংলাতে তার বিভিন্ন অর্থ আসে। যেমন - বন্দী, আবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ, গ্রেফতারকৃত, আটক, কারারুদ্ধ ইত্যাদি। আরবীতে বন্দী বুঝাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় أسير শব্দটি, কুরআন-হাদিস বা ফিকহ-ফতোয়ায় এর প্রচলন খুব বেশি। 'আসির' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা যায়, কিন্তু সবচেয়ে যুতসই ও ব্যাপক অর্থ হল বন্দী। এখানে কারাবন্দী, যুদ্ধবন্দী সবাই শামিল।

মুজাহিদ (রাহি.) বলেন: أسير শব্দের অর্থ হল مسجون অর্থাৎ কারাবন্দী বা জেলে আটককৃত ব্যক্তি। এ শব্দের বহুবচন হল: أسرى، أَسارى، أُسارى، أسراء।[2]

ইবনু আতিয়্যাহ (রাহি.) বলেন: أسير শব্দটি গৃহিত হয়েছে أسر থেকে। তার অর্থ বাঁধা। বন্দীকে পূর্বযুগে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হত, এজন্য বন্দী শব্দের মূল অর্থ বাঁধন থেকে গৃহীত। অতঃপর সকল বন্দীর ক্ষেত্রেই أسير শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন শুরু হয়েছে, চাই তাকে বাঁধা হোক বা না হোক।[3]

পারিভাষিক সংজ্ঞা: আটককৃত প্রত্যেক ব্যক্তি -চাই তাকে বাঁধা হোক বা না হোক- তাকে বন্দী বলা হবে। অর্থাৎ আটককৃত প্রত্যেক ব্যক্তি, সে যে ধর্মের হোক, বর্ণের হোক, লিঙ্গের হোক, স্থানের হোক সবার ক্ষেত্রেই এই শব্দ প্রয়োগ হবে।[4]

তবে আমরা এই বইয়ে 'বন্দী' শব্দ দ্বারা মুসলিম বন্দীদের বুঝাব, যাদের কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসুল ও দ্বীনের জন্যই কারারুদ্ধ বা বন্দী করা হয়েছে।

---

[2] লিসানুল আরব ১/১৪০।

[3] আল-মুহাররালুল ওয়াজিয ১/১৭৫।

[4] আল মাউসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ ৩/৬৯।

বন্দী মুক্তির ফজিলত

যেকোনো আমলের ফজিলত ও সওয়াব সম্পর্কে ধারণা থাকলে সেই আমলের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায় এবং তা সম্পাদন করে প্রশান্তি লাভ করা যায়। কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন স্থানে বন্দী মুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং একাধিক ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা তার কয়েকটি উল্লেখ করব—আল্লাহ তা'আলা সুরা ইনসানে জান্নাতিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

"তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকিন, এতিম ও বন্দীদের খাবার দান করে।"
(সুরা ইনসান: ৮)

অর্থাৎ যারা জান্নাতি হবে তারা এতিম, মিসকিন ও বন্দীদের খাবার দান করবে, যদি তারা ক্ষুধার্ত হয়। তাহলে যখন এতিম, মিসকিন বা বন্দীর কোনো কারণে জীবন বিপন্ন হয়ে যেতে বসবে, তখন তো আবশ্যিকভাবেই তারা সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে। বর্তমান জমানার মুসলিম বন্দীদের অবস্থা এমনই সংকটাপন্ন যে, তারা না বেঁচে থাকতে পারতেছে নূন্যতম অধিকার নিয়ে আর না মৃত্যুবরণ করে এই অমানবিক জীবনযাপন থেকে রেহাই পাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের ওপর চালানো হচ্ছে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন। শুধু আমেরিকা, চীন বা ভারতের মত অমুসলিম দেশেই নয় বরং নামধারী মুসলিম

দেশের মুরতাদ শাসকরাও এক্ষেত্রে নিকৃষ্টতম ভূমিকা পালন করছে। এই বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বাস্তবে এই সমস্ত মুসলিম পুরোপুরি নিরপরাধ, তাদের অপরাধ একটাই যে তারা মুসলিম। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

"আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।" (সুরা বুরুজ: ৮)

আবু হুরায়রা (রাদি.) বর্ণিত এক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন পার্থিব বিপদ দূর করবে আল্লাহ তা'আলা তার পরকালের বিপদ হতে কোন বিপদ দূর করবেন।"[5]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাই-বোনের কোনো দুঃখ, কষ্ট বা বিপদ -যতই ছোট বা তুচ্ছ হোক না কেন- দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন প্রতিদান স্বরূপ তার বড় কোনো বিপদ দূর করবেন। আর কিয়ামতের বিপদ দূর করা মানে জান্নাতের রাস্তা সহজ হয়ে যাওয়া।

কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে মানুষ যখন বিপদ ও কষ্ট থেকে বাঁচতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন, তাঁর বান্দার কষ্ট বা বিপদ দূর করার জন্য তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। আর এই কাজের সওয়াব তো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবেই। অর্থাৎ দুনিয়ার কোন বিপদ বা দুশ্চিন্তা ছোট-বড় যাই হোক না কেন, চাই তা ইজ্জত সংক্রান্ত হোক বা ধন-সম্পদের বিষয়ে হোক শরীয়ত সম্মত হলে তা দূর করে দিলে এটাই হবে তার

---

[5] সহিহ মুসলিম: ৬৭৪৬।

পুরস্কার। কিন্তু শরীয়ত বহির্ভূত হারাম বা মাকরূহ হলে উক্ত বিপদ দূর করা জায়েয নয়।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাদি.) থেকে বর্ণিত আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أحبُّ النّاسِ إلى اللَّهِ تعالى أنفَعُهم للنّاسِ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হলো সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।"[6] অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের যতবেশি উপকার করবে, সে আল্লাহ তা'আলার তত প্রিয় হবে। আর মানুষদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম, তাদের অন্যতম হল এই সকল মাজলুম মুসলিমগণ। আরেক হাদিসে এসেছে,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"বান্দা যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তাকে সাহায্য করবেন।"[7] অর্থাৎ যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করবে, সেই সাহায্যের নিয়ত করার সময় থেকে নিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাহায্য করা পূর্ণ হয়, এমনকি সাহায্যকৃত ব্যক্তি যতক্ষণ তার সাহায্যের দ্বারা উপকার লাভ করতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যে থাকেন।

আর যাকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য সহযোগিতা করবেন, তার দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে, অসুবিধা দূর হয়ে যাবে। এই কথাই অন্য হাদিসে এসেছে,

من نصرَ أخاهُ بالغيبِ نصرهُ اللهُ في الدنيا والآخرةِ

---

[6] আল-মু'জামুল কাবির লিত তাবরানী: ১৩৬৪৬। সহিহ।

[7] সহিহ মুসলিম: ৬৭৪৬।

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন।"[8] 'অনুপস্থিতিতে সাহায্য করা' অর্থ হল গোপনে সাহায্য করা এবং সাহায্যকৃত ব্যক্তির অগোচরে, অনবগত থাকাবস্থায় সাহায্য করা। এই অংশ হাদিসে যুক্ত করা হয়েছে সম্ভবত এ-কারণে যে কাউকে তার অগোচরে সাহায্য করলে সেটা নিরঙ্কুশ আল্লাহ তা'আলার জন্যই হয়। এখানে দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ জড়িত থাকে না। হাদিসের ভাষ্যমতে এমন অবস্থায় তো আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই বান্দাকে দুনিয়া-আখিরাতে সাহায্য করবেন।

আবু হুরায়রা (রাদি.) বর্ণিত আরেক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন:

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাস মুক্ত করবে, আল্লাহ ঐ দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার একেকটি অঙ্গকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার লজ্জজাস্থানও (মুক্ত করে দিবেন) ।"[9]

হাদিসটি যদিও 'দাস মুক্তি'র প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তবুও মুসলিম বন্দী মুক্তির ফজিলত আলোচনা করতে গিয়ে এটা উল্লেখ করার কারণ হল, অনেক আলেম বলেছেন—যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে পঞ্চম খাত যেটা 'দাস মুক্তি', সেই খাতের অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে মুসলিম বন্দীদেরও মুক্ত করা যায়। তাই এই হাদিস বন্দী মুক্তির প্রসঙ্গেও প্রাসঙ্গিক।

আর এই কথার সমর্থনে রাসুল (সা.) এর হাদিসও পাওয়া যায়। বারা বিন 'আযিব (রাদি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে,

---

[8] মাকারিমুল আখলাক লিত তাবরানী: ১৩৬। সহিহ।

[9] সহিহ বুখারী: ৬৭১৫।

جاء أَعْرابِيٌّ إِلى النَّبيِّ ﷺ فقال يا رسولَ اللهِ علِّمْني عملًا يُدْخِلُنِي الجنةَ قال لَئِنْ كنتَ أَقْصَرْتَ الخطبَةَ لقَدْ أَعْرَضتَ المسألةَ أعتِقْ النسمَةَ وفُكَّ الرقبةَ قال يا رسولَ اللهِ أوَ لَيْسَتا بواحدةٍ قال لا إنَّ عِتْقَ النسمةِ أن تُفْرَدَ بِعِتْقِها وفَكَّ النَّسَمَةِ أنْ تُعِينَ في عِتْقِها

"একজন বেদুঈন নবীজি ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।" নবীজি ﷺ বললেন, "তুমি কথা যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রশ্ন করেছ অনেক বড়। তাহলে শোনো—কাউকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করো, আর কোনো বন্দীকে মুক্ত করো।" সে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল! এ দুটি কি এক নয়?" তিনি বললেন, "না, এক নয়। কাউকে এককভাবে মুক্ত করে দেওয়া হলো 'দাসত্ব থেকে মুক্ত করা', আর কারো মুক্তিতে আর্থিকভাবে অংশ নেওয়া বা সাহায্য করাকে বলে 'বন্দী মুক্ত করা'।"[10]

এই হাদিসের 'বন্দী মুক্ত করা'-এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন, কোনো ব্যক্তিকে ঋণ, বন্দক, জেল থেকে মুক্তি কিংবা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করাই হল 'ফাক্কুর রাকাবাহ' বা 'বন্দী মুক্তি করা'।

উক্ত আলোচনা থেকে একথা বুঝা যায় যে, প্রথম হাদিসে যে রাসুল (সা.) বলেছিলেম, "মুসলিম দাস মুক্ত করলে তার প্রতিটি অঙ্গের মুক্তকারীর একেকটি অঙ্গ আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন" এই সওয়াব ও ফজিলত মুসলিম বন্দী মুক্তিকারীরও ভাগ্যেও জোটবে ইনশাআল্লাহ। আবার এই হাদিসেও রাসুল (সা.) ওই বেদুঈন সাহাবীকে জান্নাতে প্রবেশের যে দু'টো আমল বাতিলে দেন, তার একটি হল বন্দী মুক্ত করা।

মাজলুম মুসলিম কারাবন্দী মুক্তির আর অনেক ফজিলত রয়েছে। তন্মধ্যে আরেকটি হল এটি একটি মাজলুম ও ভুলে যাওয়া সুন্নত। আর রাসুল (সা.) বলেছেন,

---

[10] মুসনাদে আহমাদ: ১৮৬৪৭ (৩০/৬০০) । সহিহ।

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি আমার কোনো সুন্নত জীবিত করবে আর মানুষ সেটার উপর আমল করবে, তার জন্য রয়েছে সেই সুন্নতের উপর আমলকারীর সম-পরিমান সওয়াব। তবে তাদের সওয়াব হতে কিছুই কমানো হবে না।"[11]

বন্দীদের জীবন্ত জাহান্নাম তথা হাল জামানার জেলগুলি থেকে মুক্ত করা যেন তাদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করা, নতুন জীবন ফিরিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنۡ اَحۡيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحۡيَا النَّاسَ جَمِيۡعًا

"আর যে কারো প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"
(সুরা মায়েদা: ৩২)

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহি.) বলেন:

فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات

"বন্দী মুক্তি করা হল সবচেয়ে বড় ওয়াজিবগুলির একটি, আর এ জন্যে ওয়াকফকৃত সম্পদ বা অন্যান্য ধন-সম্পদ ব্যয় করা অনেক বড় সওয়াব অর্জনের মাধ্যম।"[12]

সুলতানুল উলামা ইযদুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম (রাহি.) বলেন:

إنقَاذُ أَسرى المسلمِينَ من أَيدِي الكُفَّار من أَفْضَلِ القُرُبات

"কাফেরদের হাতে বন্দী হওয়া মুসলমানদের মুক্ত করা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সর্বোত্তম আমলগুলির একটি।"[13]

---

[11] সুনানে ইবনু মাজাহ: ২০৯। সহিহ লি গাইরিহি।

[12] মাজমু'উল ফাতওয়া, ২৮/৬৩৫।

[13] আহকামুল জিহাদ ওয়া ফাদ্বাইলুহু: ১৯৭।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বন্দী মুক্তি

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আমরা বন্দীর সংজ্ঞা ও বন্দী মুক্তির ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব -ইনশাআল্লাহ- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বন্দী মুক্তির আহকাম বা বিধিবিধান সম্পর্কে।

আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মানুষের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনিত করেছেন, কারণ শুধুমাত্র এই দ্বীনেই রয়েছে মানুষের জন্য পরিপূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মুক্তি। ইসলাম মানুষের ফিতরাত তথা সৃষ্টিগত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহজাত ধর্ম। এইখানে যেভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রধান করা হয়েছে, তেমনিভাবে এই ধর্মে এই দিকটি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে যে— জগতে আল্লাহর সকল সৃষ্টি যেন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে।

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন-হাদিসের বহু স্থানে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মাজলুমদের অধিকার ফিরে পাওয়া, দাস মুক্তি, বন্দী মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে আমরা বন্দী মুক্তির ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য তুলে ধরব, যেখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে ইসলাম বন্দী মুক্তি বিধান কী?

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

"আর তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত কর। অথচ তাদেরকে বের করা তোমাদের জন্য হারাম ছিল।" (সুরা বাকারা: ৮৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “ইবনু খুওয়াইয মিনদাদ বলেন: এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে অনেক হাদিসও বর্ণীত হয়েছে যে, নবী ﷺ বন্দীদের মুক্ত করেছেন এবং অন্যদেরকেও মুক্ত করতে বলেছেন। যুগ যুগ ধরে মুসলমানগণ এর উপর আমল করে আসছে এবং এ বিষয়ে ইজমাও সংগঠিত হয়েছে।

বন্দী মুক্তির খরচ বায়তুল মাল থেকে দেওয়া ওয়াজিব। যদি বায়তুল মাল না থাকে, তাহলে এ দায়িত্ব সমস্ত মুসলমানের উপর ফরজ হয়ে যায়। তবে কেউ যদি এই দায়িত্ব সম্পাদন করে যথাযথভাবে, তাহলে অন্যদের থেকে দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়”।[14]

২) ইমাম জাসসাস (রাহি.) বলেন: এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা তাদের জন্য ওয়াজিব ছিল। তাদের একদলকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া তাদের জন্য হারাম ছিল। তাই যখন শত্রুরা তাদের কাউকে বন্দী করত, তখন তাদের মুক্ত করা তাদের ওপর ওয়াজিব ছিল। আর তারা যখন নিজেরাই তাদের একদলকে বের করে দিত, তখন তারা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশের প্রতি কুফরী করত, কারণ তারা এমন কাজ করত যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর তারা যখন বন্দীদের মুক্ত করত, তখন তারা কিতাবের অন্য অংশের প্রতি ঈমান রাখত, কারণ তারা এমন কাজ করত যা আল্লাহ তাদের ওপর ফরজ করেছিলেন। এই বন্দী মুক্তির বিধান এখনো আমাদের ওপর প্রযোজ্য অর্থাৎ তা আমদের ওপরও ওয়াজিব।

হাজ্জাজ বিন আরতাআহ থেকে বর্ণিত, তিনি হাকাম থেকে, আর হাকাম তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন, যাতে লেখা ছিল: ‘তারা একে অপরের ‘দিয়ত’ বা রক্তমূল্য আদায়

---

[14] তাফসীরে কুরতুবী, ২/১৭।

করবে, বন্দীদের কল্যাণকর পন্থায় মুক্ত করবে, সদাচরণ ও ইনসাফের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক মীমাংসা করবে।’[15]

৩) আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا واجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

“আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।” (সুরা নিসা: ৭৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী (রাহি.) বলেন, “আলেমগণ বলেছেন—এই আয়াতে আল্লাহ তা’আলা জিহাদকে ফরজ করেছেন—মুসলমান বন্দীদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য, যদিও এতে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। তাহলে অর্থ দিয়ে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা তো আরও বড় ফরজ, কারণ এতে প্রাণ নাশের আশঙ্কা নেই এবং অর্থ প্রাণের চেয়ে কম মূল্যবান।”[16]

৪) ইমাম কুরতুবী (রাহি.) বলেন: ‘তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না’ এই আয়াত দ্বারা জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতে এই অর্থও বিদ্যামান যে, দুর্বল মুসলমানদের কাফির মুশরিকদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে, যারা তাদের উপর নির্যাতন চালায় এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলে। সুতরাং আল্লাহ তা’আলা জিহাদকে ফরজ করেছেন, যাতে

---

[15] আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, ১/৫৭।

[16] আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী, ১/৫৩৮।

তাঁর কালিমাকে উঁচু করা যায়, তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করা যায় এবং তাঁর দুর্বল মুমিন বান্দাদের শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করা যায়, যদিও এতে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে।

আর বন্দী মুক্ত করা মুসলিম জামাতের ওপর ওয়াজিব, তা হোক যুদ্ধের মাধ্যমে বা অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে, কারণ উভয়টির ক্ষেত্রে নিশ্চিত প্রাণনাশের আশঙ্কা নেই এবং তা বিনা অপরাধে নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে সহজতর।

ইমাম মালিক (রাহি.) বলেন: মানুষের ওপর ওয়াজিব যে, তারা বন্দীদের মুক্তির জন্য তাদের সকল সম্পদ ব্যয় করবে। আর এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন: 'তোমরা বন্দীকে মুক্ত করো'।[17]

৫) ইমাম শাওকানী (রাহি.) বলেন, "আয়াতে 'অসহায়-দুর্বলদের' শব্দটি 'আল্লাহর পথে' শব্দের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে এবং সেইসাথে দুর্বল-অসহায় মানুষদের মুক্ত করার জন্যও যুদ্ধ করতে হবে, যাতে তারা বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায় এবং যেসব কষ্টে রয়েছে তা থেকে রেহাই পায়।"[18]

৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদেরকে সাহায্যের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি

---

[17] তাফসীরে কুরতুবী, ৫/২৭৯।

[18] ফাতহুল কাদির, ১/৪৮৭।

তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এমন কওমের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।" (সুরা আনফাল: ৭২)

ইমাম কুরতুবী (রাহি.) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেন, "অর্থাৎ, যদি সে সমস্ত মুমিনগণ, যারা কাফের ভূমি থেকে হিজরত করেনি, কাফেরদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমাদের কাছে সাহায্য চায়—হোক তা সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে বা অর্থের মাধ্যমে—তবে তাদের সাহায্য কর। এটি তোমাদের উপর ফরজ। তাদেরকে অসহযোগিতা করো না। তবে যদি তারা এমন কোনো কাফির জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করবে না, এবং চুক্তির সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি ভঙ্গ করবে না।

ইবনুল আরাবি (রাহি.) বলেন: যদি তারা বন্দী ও দুর্বল অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করা ও তাদেরকে সাহায্য করা ফরজ, তাহলে চোখের পলক ফেলার সময়ক্ষেপণ না করেই আমরা তাদের উদ্ধারে বের হব, যদি আমাদের লোকবল তাতে সক্ষম হয়। নতুবা আমাদের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে তাদের মুক্ত করতে হবে, এমনকি শেষ দিরহাম পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে হবে। এটাই ইমাম মালিক ও সকল আলেমদের মত।

ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন—এখনকার মানুষের কী দুর্ভাগ্য! তারা তাদের ভাইদের শত্রুদের হাতে বন্দী হতে দেখছে, অথচ তাদের কাছে রয়েছে প্রচুর ধন-সম্পদ, শক্তিশালী জনবল, বিরাট ক্ষমতা। কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।"[19]

---

19 তাফসীরে কুরতুবী, ৮/৫৬।

৭) আবু মুসা আশয়ারী (রাদি.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন:

فُكُّوْا الْعَانِيَ يَعْنِي الأَسِيْرَ وَأَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ

“তোমরা বন্দী মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াও এবং রুগীর সেবা-শুশ্রূষা কর।”[20]

৮) আবু জুহাইফা (রাদি.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আছে,

قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ لَا وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيْرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

“আমি আলী (রাদি.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কুরআনে যা কিছু আছে তা ব্যতীত আপনাদের নিকট ওহীর আর কোনো কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, সে আল্লাহ তা‘আলার কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন। আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং এ সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কী আছে? তিনি বললেন, দিয়তের বিধান, বন্দী মুক্ত করা এবং কোনো মুসলিমকে যেন কোনো কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয়।”[21]

৯) সালামা বিন আকওয়া’ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ - قَالَ الْقِشْعُ النِّطَعُ - مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ فَقَالَ " يَا

---

[20] সহিহ বুখারী: ৩০৪৬।

[21] সহিহ বুখারী: ৩০৪৭।

سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي " يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ " . فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ .

“আমরা ফাযারাহ গোত্রের সাথে যুদ্ধ করছিলাম। আবু বকর (রাদি.) ছিলেন, আমাদের আমীর। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। যখন আমাদের এবং পানির স্থানের মাঝে একঘন্টা সময়ের ব্যবধান ছিল, তখন আবু বকর (রা.) আমাদেরকে (রাতের শেষের দিকে সেখানে অবতরণের) নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমরা রাতের শেষাংশেই সেখানে অবতরণ করলাম। এরপর বিভিন্ন দিক দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পানির নিকট পৌঁছলেন। আর যাদেরকে তার বিরুদ্ধে পেলেন হত্যা এবং বন্দী করলেন। আমি লোকদের একটি দলকে দেখতে পাচ্ছি যাদের মধ্যে শিশু ও নারী রয়েছে।

আমি আশংকা করছিলাম যে, তারা হয়তোবা আমার আগেই পাহাড়ে পৌঁছে যাবে। অতএব আমি তাদের ও পাহাড়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ করলাম। তারা তখন তীর দেখতে পেয়ে থেমে গেলো। তখন আমি তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম। তাদের মাঝে চামড়ার পোষাক পরিহিত বানী ফাযারার একজন মহিলাও ছিল এবং (রাবী বলেন) তার সঙ্গে এক কন্যা ছিল। সে ছিলো আরবের সব চেয়ে সুন্দরী। আমি সকলকেই হাঁকিয়ে আবু বকর (রা.)-এর কাছে নিয়ে এলাম। আবু বকর (রা.) মহিলার কন্যাটি আমাকে নফল হিসেবে প্রদান করলেন।

এরপর আমি মদীনায় ফিরে এলাম। আমি তখনও তার বস্ত্র উঠাইনি। পরে বাজারে আমার সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন হে সালামাহ! তুমি মহিলাটি আমাকে দিয়ে দাও। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আল্লাহ তা’আলার কসম, তাকে আমার অত্যাধিক পছন্দ হয়েছে এবং এখনও আমি তার

বস্ত্র উঠাইনি। পরের দিন আবারও বাজারে আমার সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, হে সালামাহ! তুমি মহিলাটি আমাকে দিয়ে দাও। "আল্লাহ তোমার পিতার কল্যান করুন।" তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আল্লাহর কসম! সে আপনার জন্যই। আমি তার বস্ত্র উন্মোচন করিনি। অতঃপর আল্লাহর রাসুল (সা.) ওই কন্যাটিকে মাক্কায় পাঠিয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে কয়েকজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করে আনলেন, যারা মাক্কায় ইতোপূর্বে বন্দী ছিল।"[22]

১০) আরেকটি হাদিস সুনানে তিরমিজিসহ একাধিক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

ইমরান বিন হুসাইন (রাদি.) হতে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ (সা.) একজন মুশরিক বন্দীর বিনিময়ে দু'জন মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করে আনলেন।"[23]

১১) আবু হুরায়ারা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ " اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ".

"নবী (সা.) যখন শেষ রাকাতে (রুকু) থেকে মাথা উঠালেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ! আইয়্যাশ বিন আবু রাবী'আহকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! সালামা বিন হিশামকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! দূর্বল মুমিনদেরকে মুক্তি কর। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর তোমার শাস্তি

---

[22] সহিহ মুসলিম: ৪৪৬৫।

[23] সুনানে তিরমিজি: ১৫৬৮। সহিহ।

কঠোর করে দাও। হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ.)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত (এদের উপরে) ও কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দাও।”[24]

১২) মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে,

أنَّ النبيَّ ﷺ كتَب كتابًا بينَ المهاجرين والأنصارِ أنْ يَعقِلوا معاقلَهم وأنْ يَفدوا عانيَهم بالمعروفِ والإصلاحُ بينَ المسلمين

“রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন, যাতে লেখা ছিল: ‘তারা একে অপরের ‘দিয়ত’ বা রক্তমূল্য আদায় করবে, বন্দীদের কল্যাণকর পন্থায় মুক্ত করবে, সদাচরণ ও ইনসাফের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক মীমাংসা করবে’।[25]

১৩) ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে,

من فَدَى أَسِيرًا من أَيدِي العَدُوِّ فَأَنَا ذَلِكَ الأَسِيرُ

“যে ব্যক্তি কোনো বন্দীকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করবে, সে যেন আমাকে মুক্ত করল।”[26]

উপরের আলোচনা থেকে আশা করা যায়—এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব, হোক না তা কিতালের মাধ্যমে, অর্থ প্রদানের বিনিময়ে কিংবা শরীয়াহসম্মত অন্য কোনো উপায়ে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এ বিষয়ে আরও বহু দলিল পেশ করা সম্ভব; তবে বিষয়টি সুস্পষ্ট

---

[24] সহিহ বুখারী: ১০০৬।

[25] মুসনাদে আহমাদ: ২৪৪৩। অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদিসটির সনদ ‘দুর্বল’ বলেছেন। তবে আহমাদ শাকির ‘সহিহ’ বলেছেন। হাদিসের সনদ দুর্বল হলেও মর্ম সহিহ। আল্লাহ তা’’আলাই অধিক জ্ঞাত।

[26] মাজমা’উয যাওয়াঈদ ওয়া মানবা’উল ফাওয়াঈদ: ৯৭০৩ (৫/৩৩২)। ইমাম হাইসামীর কথা থেকে বুঝা যায় হাদিসটি গ্রহণযোগ্য।

হওয়ার পর অপ্রয়োজনীয়ভাবে আলোচনা দীর্ঘ করে লেখার কলেবর বাড়ানোর ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুভব করছি না।

পরবর্তী অধ্যায়ে, ইনশাআল্লাহ, আমরা মুসলিম বন্দী মুক্তির বিষয়ে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব—যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের পূর্বসূরি আলেমগণ এই বিষয়ে কতটা গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তারা এটিকে মুসলিম সমাজের জন্য কতটা আবশ্যকীয় ও দায়িত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতেন।

বন্দী মুক্তির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য

এই অধ্যায়ে আমরা ইমামগণের বক্তব্য উল্লেখের সাথে অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের বক্তব্যও উল্লেখ করব। বিষয়টি বিশদভাবে উল্লেখের আরেকটি কারণ হল—যেন আমরা তাদের তুলনায় নিজেদের অবস্থা অনুধাবন করতে পারি যে আমরা কতটুকু উদাসীন, গাফেল এবং দায়িত্বহীন বন্দী মুক্ত করার এই গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব বিধানের ব্যাপারে।

১) হজরত উমর বিন খাত্তাব (রাদি.) বলেন: "কোনো মুসলমানকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারা আমার নিকট গোটা আরব উপদ্বীপের অধিক প্রিয়।"[27]

২) হজরত উমর (রাদি.) বলেন: "মুশরিকরা বন্দি করে রেখেছে এমন প্রত্যেক মুসলমানের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় খরচ মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা হবে।"[28]

৩) উমর বিন আব্দুল আজিজ (রাহি.) বলেন: "যদি কোনো রোমান* কোনো মুসলিমকে ধরে বন্দী করে নিয়ে যায়, তবে মুসলমানদের জন্য এটা জায়েজ নয়

---

[27] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা: ৩৩২৫৩। হাসান।

[28] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা: ৩৩২৬২। এটির সনদ দুর্বল হলেও মর্ম সহিহ।

যে, তারা তাকে (নির্দ্বিধায়) কাফের দেশে যেতে দিবে। বরং মুসলমানদের উচিত তাকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।”[29]

৪) একবার উমর বিন আব্দুল আজিজ (রাহি.) আব্দুর রহমান বিন আবি উমারাকে কনস্টান্টিনোপল থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি গিয়ে বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন, যদি তারা একজনের বিনিময়ে একজন বন্দী দিতে রাজি না হয়, তাহলে কী করব? উমর বললেন: তাদের আর বাড়িয়ে দিবে। তিনি বললেন: যদি তারা চারজনের বিনিময়ে একজন মুসলমানকে দিবে বলে? তিনি বললেন: প্রত্যেক মুসলমানের মুক্তির জন্য তারা যা চাইবে, তা-ই দাও। আল্লাহর কসম, একজন মুসলমান আমার কাছে থাকা সমস্ত মুশরিকদের তুলনায় অধিক প্রিয়। তুমি একজন মুসলমানের মুক্তির জন্য যা দেবে, সেটাই তোমার সফলটা। আর মনে রেখো, তুমি মূলত মুশরিকদের মোকাবেলায় ইসলামকেই কিনছ।[30]

৫) ইমাম মালিক (রাহি.) বলেন: “মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হলো তারা তাদের বন্দিদের মুক্ত করবে, এমনকি এতে যদি সমস্ত সম্পদ খরচ হয়ে যায়, তবুও এটা করতে হবে।”[31]

৬) ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানী (রাহি.) বলেছেন: বায়তুল মাল মূলত সৃষ্টিই হয়েছে মুসলমানদের বিপদ-আপদে সাহায্য করার জন্য। তাই বায়তুল মালের অর্থ দিয়েই মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করতে হবে।[32]

---

[29] সুনানে সাইদ বিন মানসুর, ২/২৯৩।

*এখানে রোমানদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, তখন মুসলমানদের সাথে রোমানদের যুদ্ধ চলছিল।

[30] আল-আওসাত লি ইবনিল মুনযির, ১১/২৩৯।

[31] আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী, ১/৮৮।

[32] শারহুস সিয়ারিল কাবির: ১৫৯৩ পৃষ্ঠা।

৭) ইমাম ইবনুল কুদামা (রাহি.) বলেন: "বন্দী মুক্তির অধ্যায়: যদি সক্ষমতা থাকে, তাহলে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা ওয়াজিব। এই মতটি উমর বিন আব্দুল আজিজ, ইমাম মালিক, ইসহাকসহ অনেকেরই।

একবার হাসান বিন আলী (রাহি.)-কে ইবনুয যুবাইর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব কার উপর?' তিনি বলেন: 'যে ভূমিতে যুদ্ধ চলছে, সেই ভূমির অধিবাসীদের ওপর।'

আর রাসুলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন: 'ক্ষুধার্তকে খাওয়াও, অসুস্থকে দেখতে যাও, আর বন্দী মুক্তি করো।' আর হিব্বান বিন জাবলাহ থেকে সাইদের বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'মুসলিমদের ধনসম্পদ থেকে বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে।' আরো বর্ণিত আছে রাসুলুল্লাহ ﷺ মুহাজির-আনসারদের মধ্যে চুক্তি করেছিলেন যে, 'তারা একে অপরের ক্ষতিপূরণ বহন করবে এবং বন্দীদের মুক্ত করবে।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বনি উকাইলের বন্দীর বিনিময়ে দুইজন মুসলিমকে মুক্ত করেন, এবং সালামা বিন আকওয়া (রাদি.)-এর কাছ থেকে পাওয়া এক নারীর বিনিময়ে দুইজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করেন।

এসব দলিলাদি প্রমাণ করে যে, বন্দী মুক্তির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই—যে যে উপায়ে মুক্ত করা সম্ভব, তা করাই ওয়াজিব। ফকীহগণের অভিমতও তাই: যদি বন্দী মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করা সম্ভব হয়, তাহলে যুদ্ধও করা ফরজ হবে।"[33]

৮) ইমাম সারাখসী (রাহি.) বলেন: "যদি কোনো মুসলমান শত্রুদের হাতে বন্দী হয়ে যায় এবং তারা তাকে হত্যা করতে চায়, তাহলে যে জানবে, তার দায়িত্ব হল সে যেন নিজের অর্থ খরচ করে তাকে মুক্ত করে, যদি সে এতে সক্ষম হয়। আর

---

[33] আল-মুগনী লি ইবনিল কুদামা, ৯/২২৮।

যদি তার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে এমন ব্যক্তিকে জানাবে যে সক্ষম। আর যদি বন্দী ব্যক্তিকে কোনো মুসলমান মুক্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যদের উপর থেকে দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে।”[34]

৯) ইমাম সারাখসী আরেক জায়গায় উল্লেখ করেন, কোনো মুসলিম বন্দীকে মুশরিক বন্দীর বিনিময়ে মুক্ত করা – এ বিষয়ে, ইমাম আবু হানিফা (রাহি.)-এর দুই মতের মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হলো: এটি বৈধ নয়। তবে, তার আরেকটি মতে পাওয়া যায় যে তিনি অনুমতি দিয়েছেন, এবং এ মতটি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহি.)-এরও।

এর কারণ, এতে মুসলমানকে মুশরিকদের শাস্তি ও ধর্মীয় ফিতনা থেকে হেফাজত করা যায়, আর এটি তো অনুমোদিত। যেমন মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করতে ঘোড়া, অস্ত্র বা অন্য কোনো সম্পদ বিনিময় করাও বৈধ।[35]

১০) ইমাম নববী (রাহি.) বলেন: যদি শত্রুরা এক বা একাধিক মুসলমানকে বন্দী করে নেয়, তাহলে এটি কি ইসলামী ভূখণ্ডে আক্রমণের মধ্যে শামিল হবে কি না – এ বিষয়ে দুইটি মতামত রয়েছে। একটি মত হল: না, কারণ মাত্র একজন বা দুইজন সৈন্যকে জোরপূর্বক অপহরণ অস্বাভাবিক। তবে, সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো: হ্যাঁ, কারণ একজন মুসলমানের মর্যাদা ইসলামী ভূমির মর্যাদার চেয়েও বেশি। তাই আমাদের সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি বন্দীদের অবস্থান ইসলামী ভূখণ্ডের নিকটবর্তী হয় এবং আমাদের মনে হয় যে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব, তাহলে আমাদের অভিযান করতে হবে।[36]

---

[34] আল-মাবসুত লিস সারাখসী, ৩০/২৭১।

[35] আল-মাবসুত লিস সারাখসী, ১০/১৩৯।

[36] রওদাতুত তালীবীন, ১০/২১৬।

১১) শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহি.) বলেন: "বন্দী মুক্তি করা হল সবচেয়ে বড় ওয়াজিবগুলির একটি, আর এ জন্যে ওয়াকফকৃত সম্পদ বা অন্যান্য ধন-সম্পদ ব্যয় করা অনেক বড় সওয়াব অর্জনের মাধ্যম।"[37]

১২) ইমাম ইযদুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম (রাহি.) বলেন: কাফেরদের হাতে বন্দী হওয়া মুসলমানদের মুক্ত করা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সর্বোত্তম আমলগুলির একটি। আর কিছু আলিম বলেছেন: যদি কাফেররা একজন মুসলমানকেও বন্দী করে, তাহলে আমাদের উপর যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যতক্ষণ না তাকে মুক্ত করা যায় বা শত্রুপক্ষ ধ্বংস না হয়। তাহলে যখন অনেক মুসলমান বন্দী হয়ে যাবে, তখন আমাদের কী করণীয় হতে পারে?[38]

১৩) ইমাম ইবনু হাযম (রাহি.) বলেন: "উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো মুসলমান বন্দিকে মুক্ত করা যদি অর্থ ছাড়া সম্ভব না হয়, তাহলে শত্রুদেরকে অর্থ দিয়ে তাদের মুক্ত করা ওয়াজিব।"[39]

১৪) ইবনু হাজার হাইতামি (রাহি.) বলেছেন: "যদি কোনো মুসলিম শত্রুদের হাতে বন্দী হয়, তাহলে তার মুক্তির জন্য অবিলম্বে যাত্রা করা প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের উপর ফরজ—এমনকি যদি সে একজন দাসও হয়, তবুও অনুমতির প্রয়োজন নেই। যদিও কিছু আলেম ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তবুও সঠিক বক্তব্য হলো, যদি মুক্তির আশা থাকে—চাই তা খুব সামান্যই হোক—তাহলে এটি ফরজে আইন, যেমন শত্রুরা আমাদের দেশে আক্রমণ করলে তা প্রতিরোধ করা ফরজ। বরং মুসলিমের সম্মান আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

---

[37] মাজমু'উল ফাতওয়া, ২৮/৬৩৫।

[38] আহকামুল জিহাদ ওয়া ফাদ্বাইলুহু: ১৯৭।

[39] মারাতিবুল ইজমা লি ইবনি হাযম: ১২২ পৃষ্ঠা।

আর শাসক ও প্রত্যেক সচ্ছল মুসলিমের উচিত মুক্তির জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করা। শান্তিচুক্তির প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে, তবে যদি মুক্তির অন্য কোনো উপায় না থাকে, তাহলে তাদের মুক্তির জন্য অর্থ বিনিময় করা ফরজ।”[40]

১৫) ইমাম মুহাম্মাদ (রাহি.) বলেছেন: “মুসলমানদের হাতে থাকা সেই সকল মুশরিক নারী পুরুষ, যারা বন্দী অবস্থায় আছে তাদের বিনিময়ে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা জায়েজ।”

(ইমাম সারাখসী বলেন) এটি আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রাহি.)-এর মত, এবং এটি আবু হানিফা (রাহি.)-এর দুইটি বর্ণনার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বর্ণনা।[41]

১৬) 'মালিকুল উলামা' খ্যাত 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী বলেন: বন্দীদের মুক্ত করার জন্য দিরহাম, দিনার, কাপড়চোপড় বা এ জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে মুক্তিপণ দেওয়া বৈধ, যতক্ষণ না এসব জিনিস শত্রুকে যুদ্ধে সাহায্য করে না। তবে অস্ত্র দিয়ে মুক্তিপণ দেওয়া যাবে না, কারণ এতে শত্রুর সামরিক শক্তি বাড়ে।”[42]

১৭) ইমাম বুহুতী (রাহি.) বলেন: “মুসলিম বন্দীকে বায়তুল মাল থেকে মুক্ত করা হবে। কারণ, সাঈদ হিব্বান বিন আবি জাবলা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যুদ্ধ ব্যতীত অর্জিত সম্পদ থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করতে হবে এবং তাদের ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে।” আসলে, বায়তুল মাল মুসলমানদের কল্যাণার্থেই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর মুসলিম বন্দীদের মুক্তি করাই সবচেয়ে কল্যাণকর কাজের অন্যতম।”[43]

---

[40] তুহফাতুল মুহতাজ, ৯/২৩৬।

[41] শারহুস সিয়ারিল কাবির: ১৫৮৭ পৃষ্ঠা।

[42] বাদাঈ'য়ুস সানাঈ', ৭/১২০।

[43] কাশশাফুল কিনা' 'আন মাতনিল ইক্বনা', ৩/৫৫।

১৮) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনু বাত্তাল (রাহি.) বলেন: “বন্দীদের মুক্ত করা ফরজে কিফায়া। এটি জমহুর উলামায়ে কেরামের মত। ইসহাক ইবন রাহওয়াই বলেছেন: বন্দী মুক্তির খরচ বায়তুল মাল থেকে বহন করা হবে। ইমাম মালিক থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[44]

১৯) ইবনু জুযঈ মালিকি বলেছেন: “যুদ্ধের মাধ্যমে বন্দী মুসলমানদের কাফিরদের হাত থেকে উদ্ধার করা ফরজ। তবে যদি মুসলিমরা তা করতে অক্ষম হয়, তখন তাদের অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ধনী বন্দীগণ নিজের মুক্তির অর্থ নিজ সম্পদ থেকে দিবে আর দরিদ্র বন্দীদের মুক্তির দায়িত্ব শাসকের, যা বায়তুল মাল থেকে দেওয়া হবে। আর বাকি যা প্রয়োজন হবে, তা সকল মুসলিমদের সম্পদ থেকে সংগ্রহ করা হবে—এমনকি যদি সে কারণে মুসলমানদের সমস্ত সম্পদই শেষ হয়ে যায়।”[45]

২০) শরীয়ত বন্দী মুক্তির বিষয়টিতে জোর দিয়েছে এবং এটিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। মালিকী মাযহাবের আলেমগণ ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামও বলেছেন: বন্দীদের মুক্তি করা ওয়াজিব (মুসলমানদের উপরে), এমনকি এর কারণে যদি একটি দিরহামও অবশিষ্ট না থাকে।[46]

২১) আর “আর বন্দীকে মুক্ত করো।” অর্থাৎ, কোনো মুমিন যদি শত্রুদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে এবং তোমার যদি তাকে মুক্ত করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে তোমাকে সেটার চেষ্টা করতে হবে, এবং এটা তোমার ওপর আবশ্যক। মুসলমানদের উচিত নয় যে তারা নিজেদের ভাইদের কাফিরদের হাতে ফেলে রাখবে, বরং আরও জঘন্য কাজ হলো—যদি তারা নিজেরা কাফিরদের সহযোগিতা করে মুসলমানদের বন্দী

---

[44] ফাতহুল বারী, ৬/১৬৭।

[45] আল কাওয়ানিনিল ফিকহিয়্যাহ লি ইবনিল জুযঈ: ১১৪ পৃষ্ঠা।

[46] আত-তাফসিরুল মুনীর লি ওয়াহবাতুয যুহাইলী, ১/২১৭।

করাতে সাহায্য করে। তাই মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হলো—যেসব মুমিন কাফিরদের হাতে বন্দী হয়ে আছে, তাদের মুক্ত করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: "আর বন্দীকে মুক্ত করো"—অর্থাৎ তোমরা নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে তাদের মুক্ত করে আনো।[47]

২২) ইমাম মালিক (রাহি.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো: মুসলিমদের কেউ বন্দী হলে তাদের মুক্ত করা কি মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই। মুসলমানদের ওপর কি যুদ্ধ করা ওয়াজিব নয়, যাতে তারা বন্দীদের উদ্ধার করতে পারে? উত্তর হলো: হ্যাঁ, ওয়াজিব। তিনি বললেন: তাহলে কীভাবে তারা নিজেদের সম্পদ খরচ করে বন্দীদের মুক্ত না করে থাকতে পারবে?

মুহাম্মাদ বিন রুশদ (রাহি.) বলেছেন: ইমাম মালিকের বক্তব্যের অর্থ হলো, মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা পুরো মুসলিম উম্মাহর ওপর ওয়াজিব। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'বন্দীদের মুক্ত করো'। যেহেতু এটি একটি আদেশসূচক বাক্য, তাই এটি ওয়াজিব। ইমাম মালিকের পেশ করা দলিলই এটি ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

অতএব, বন্দী মুসলিমদের মুক্ত করার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপ্রধানের এবং এর সমস্ত খরচ বায়তুল মাল থেকে বহন করা হবে। যদি বায়তুল মালের সম্পদ যথেষ্ট না হয়, তবে প্রত্যেক মুসলিমের সামর্থ্য অনুযায়ী তার উপর এই দায়িত্ব বর্তাবে।[48]

উপরে উল্লিখিত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত—পৃথিবীর কোথাও কোনো মুসলিম যদি কাফেরের হাতে বন্দী হয়ে যায়, তাহলে তাকে মুক্ত করা ওয়াজিব; হয়তো কিতালের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো পন্থায়। যদি ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকে, তাহলে

---

[47] শরহু রিয়াদুস সালিহীন, আহমদ হাতিবা, ৮৩ খণ্ড (এটা মূলত দারস নাম্বার), ১১ পৃষ্ঠা।

[48] আল-বায়ান ওয়াত তাহছীল ওয়াশ শারহ ওয়াত তাওজীহ ওয়াত তা'লীল লি মাসাঈলিল মুসতাখরাজাহ লি মুহাম্মাদ বিন রুশদ আল-জাদ্দ: ২/৫৬০।

রাষ্ট্রের শাসকের উপর এই দায়িত্ব বর্তাবে। যদি কিতালের মাধ্যমে বন্দী মুক্ত করার সক্ষমতা থাকে, তাহলে কিতালের মাধ্যমেই মুক্ত করতে হবে। আর যদি সেই সক্ষমতা না থাকে, তাহলে পারস্পরিক বন্দী বিনিময় বা মুসলিম বন্দীর বিনিময়ে কাফেরদের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মুক্ত করতে হবে।

আর এই অর্থ, যদি ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকে, তাহলে বায়তুল মাল তথা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খরচ করা হবে। আর যদি কোনো ইসলামী রাষ্ট্র না থাকে, তাহলে তা সকল ধনী ও বিত্তশালী মুসলমানদের উপর ফরজে কিফায়া হিসেবে ফরজ হয়ে যাবে। এবং প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী গুনাহগার হবে এই দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে। তবে, যদি কিছু লোক এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়—অর্থাৎ বন্দী মুক্তির কার্যক্রমে অংশ নেয় এবং তা সার্বিকভাবে উক্ত কার্যক্রমের জন্য যথেষ্ট হয়—তাহলে অবশিষ্ট লোকদের দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে।

বন্দী মুক্তির ক্ষেত্রে যাকাত দেয়ার বৈধতা

এই মাসআলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, স্বার্থপরতার এই যুগে মুসলমানদের মাঝে এমন প্রবণতা ব্যাপক আকারে দেখা যায় যে—নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে কোনো মজলুম মুসলমান ভাইকে রক্ষা করা তার নিকট অপব্যয় মনে হয়। অথবা সে মনে করে, তার সম্পদে সেই বন্দী মুসলমান ভাইয়ের কোনো হক নেই।

ফলে বন্দী মুক্তির মতো একটি মহৎ ও জরুরি কাজ বহু সময় আর্থিক সংকটের কারণে থমকে যায় কিংবা দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ, যদি এই মাসআলাটি মুসলিম সমাজে সঠিকভাবে প্রচারিত হয়, তাহলে মানুষ অন্তত নিজ নিজ যাকাত থেকে এই খাতে অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত হবে। এর ফলে, বন্দী মুক্তির এই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় আরও বেগবান ও কার্যকর হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম কুরতুবী (রাহি.) বলেছেন: "যাকাতের মাল থেকে বন্দীদের মুক্ত করা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আসবাগ বলেছেন: তা থেকে তাদের মুক্ত করা জায়েজ নয়, আর এটি ইবনে কাসিমেরও মত।

তবে ইবনে হাবীব বলেছেন: হ্যাঁ, তা থেকে মুক্ত করা জায়েজ, কারণ তারা এক ধরণের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে গেছে, আর সেখান থেকে তাদের মুক্ত করা মানে দাসত্ব থেকে স্বাধীন করা। আর এটি তো আমাদের হাতে থাকা দাসদের মুক্তির চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মুসলমানকে মুসলমানের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা যখন ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় এবং তা যাকাতের মাল থেকে বৈধ হয়, তখন

মুসলমানকে কাফেরের দাসত্ব ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করা আরও বেশি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।"[49]

ইমাম ইবনু কুদামা (রাহি.) বলেছেন: "মুসলিম বন্দীকে মুশরিকদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ খরচ করা বৈধ। কারণ, এটি এক প্রকার বন্দিত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়া, যা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মতোই। এছাড়া, এতে ইসলামের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, যা 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' খাতে যাকাত দেওয়ার মতোই। আর এই অর্থ বন্দীর বন্দিত্ব থেকে মুক্তির জন্য খরচ করা হয়, যা ঋণগ্রস্তের ঋণমুক্তির জন্য খরচ করার মতো।"[50]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহি.) বলেছেন: "যাকাতের মাল থেকে দাসকে আযাদ করা জায়েজ এবং মুসলিম বন্দীদেরও তা দিয়ে মুক্ত করা জায়েজ। আর এটাই ইমাম আহমদ (রাহি.)-এর মত।"[51]

শাইখ আবদুল আজিজ বিন বায (রাহি.) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলার বাণী: " وَفِي الرِّقَابِ"-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সঠিক মত হলো মুসলিম বন্দী মুক্ত করাও এর মধ্য শামিল। অর্থাৎ, কাফেরদের হাতে আটক মুসলিমদের মুক্ত করার জন্য তাদের কাছে মুক্তিপণ দিয়ে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা, যেন তারা মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করে দেয়।"[52]

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রাহি.) বলেছেন: "الرِّقَاب" শব্দের ব্যাখ্যা উলামায়ে কেরাম তিনভাবে করেছেন।

---

[49] তাফসীরে কুরতুবী, ৮/১৮৩।

[50] আল-মুগনী লি ইবনি কুদামাহ, ৬/৪৭৯।

[51] আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৫/৩৭৪।

[52] মাজমু'উ ফাতওয়াশ শাইখ বিন বায, ১৪/১৫।

- প্রথমত: এমন মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) দাস, যে তার মুক্তির জন্য মালিককে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করছে; তাকে যাকাত থেকে এমন পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে যা দিয়ে সে পুরো টাকা পরিশোধ করতে পারে।
- দ্বিতীয়ত: এমন দাস, যাকে যাকাতের অর্থ দিয়ে কিনে মুক্ত করে দেওয়া হয়।
- তৃতীয়ত: এমন মুসলিম বন্দী, যাকে কাফেররা বন্দী করেছে; তাকে মুক্ত করতে কাফেরদের কাছে যাকাতের অর্থ দিয়ে মুক্তিপণ প্রদান করা হয়।[53]

ইমাম বুহুতী (রাহি.) বলেন: "যাকাতের অর্থ দিয়ে মুসলিম বন্দীকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করা জায়েজ। কারণ, এটি বন্দিত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির শামিল, যা দাসত্ব থেকে কোনো দাসকে মুক্ত করার মতো। আর এতে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, যা 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' খাতে যাকাত দেওয়ার মতোই। আর এই অর্থ বন্দীকে তার মুক্তির জন্য দেওয়া হয়, যা ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য করার মতোই।"[54]

"মুশরিকদের হাতে বন্দী মুসলিমকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যাবে। এ বিষয়ে হানাবলি মাজহাবের আলেমগণ, ইবনু হাবীব এবং মালিকি মাজহাবের ইবনু আব্দিল হাকাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এটি বৈধ। কারণ, এটিও এক প্রকার শৃঙ্খল (বন্দিত্বের শৃঙ্খল) থেকে মুক্তকরণ, যা কোরআনের আয়াতে অন্তর্ভুক্ত, বরং আমাদের নিকট থাকা কোনো দাসকে মুক্ত করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটি।"[55]

---

[53] মাজমু'উ ফাতওয়া ওয়া রাসাঈলিশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন, ১৮/৩৩৪।

[54] কাশশাফুল কিনা' 'আন মাতনিল ইক্বনা', ২/২৮০।

[55] আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাতুল কুওয়াইতিয়্যাহ, ২৩/৩২০।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহি.) বলেছেন: "আল্লাহর বাণী "وَفِي الرِّقَابِ"-এর মধ্যে মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) দাসদের সাহায্য করা, মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা এবং দাসদের আযাদ করে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত। এটি আয়াতের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।"[56]

ইমাম তাবারী (রাহি.) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা মৌলিকভাবে সাদাকাহ তথা যাকাতের দুটো ব্যয়খাত নির্ধারণ করেছেন:

- প্রথমত, মুসলমানদের দরিদ্রতা ও অভাব দূর করা।
- দ্বিতীয়ত, ইসলামকে সহায়তা করা ও শক্তিশালী করা।"[57]

এছাড়াও বহু আলেমের বক্তব্যে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে—মুসলিম বন্দীদের মুক্তির উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা শরিয়তসম্মত ও বৈধ। বরং বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায়, যেখানে অসংখ্য নিরপরাধ মুসলমান অন্যায়ভাবে বন্দী জীবনযাপন করছে, সেখানে এই খাতে যাকাত প্রদান করা আরও অধিক প্রাধান্যযোগ্য।

---

[56] মাজমু'উল ফাতওয়া, ২৮/২৭৪।

[57] তাফসীরে তাবারী, ১৪/৩১৬।

কাফের-মুশরিকদের হাতে বন্দী ও বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের শাসকদের হাতে বন্দীর ক্ষেত্রে বিধানের অভিন্নতা[58]

এই অধ্যায়ের শিরোনাম এটাও হতে পারে—কাফের রাষ্ট্রে বন্দী থাকা মুসলমান এবং নামধারী মুসলিম শাসক অধ্যুষিত রাষ্ট্রে বন্দী থাকা নিরপরাধ* মুসলমান বন্দীর ক্ষেত্রে বিধানের অভিন্নতা।

ভূমিকায় আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলো যতটা সম্ভব সহজ ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব, যেন সাধারণ মুসলমানও এটি পাঠ করে নিজের দায়িত্ব সহজে বুঝে নিতে পারে। এই অধ্যায়টি গ্রন্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ এখানের আলোচনাগুলো একদিকে আমাদের আকিদা সম্পর্কিত, অন্যদিকে এর সঙ্গে আমাদের 'বিজয় ও অগ্রগতি' এবং 'পরাজয় ও অধঃপতন'-এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

প্রথমেই একথা উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি যে, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ পরিচালিত হচ্ছে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানুষের তৈরি সংবিধান অনুযায়ী। আর মুসলমান নামধারী শাসকগণ এ সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করছে, তারা স্বেচ্ছায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে এই কাজ করে চলেছে।

---

[58] এই অধ্যায় একইসাথে স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আলোচিত বিষয়গুলি যখন পুরো উম্মাহর মুসলমানগণ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে, তখন থেকেই এই উম্মাহ 'বিজয়ী উম্মাহ' হওয়ার পথে সবেগে যাত্রা শুরু করবে ইনশাআল্লাহ।

* নিরপরাধ শব্দ উল্লেখ করে এটা বুঝানো হয়েছে যে, শরীয়াহর দৃষ্টিতে 'নিরপরাধ' হতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের যেসব মৌলিক অধিকার রয়েছে তার অধিকাংশ থেকেই তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

অন্যদিকে এসব রাষ্ট্রে কাফেরদেরকে মুসলমানদের মতোই অধিকার প্রদান করা হচ্ছে—বরং কখনো কখনো মুসলমানদের তুলনায় তাদেরই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, এই মুসলিম নামধারী শাসকগণ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'হালাল' ঘোষিত বিষয়কে 'হারাম' এবং 'হারাম' ঘোষিত বিষয়কে 'হালাল' ঘোষণা করছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর বিরোধিতা ও কটূক্তিকারীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। তাদের অপরাধ ও পাপের তালিকা অনেক দীর্ঘ, কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে কেবল অল্প কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো।

এখন আমরা সংক্ষেপে শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু কথা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে চাইলে 'টীকা'য় উল্লিখিত বইসমূহ দেখা যেতে পারে।[59]

বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা যেসব কারণে কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে:

---

[59] এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দেখার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি দেখা যেতে পারে:

১) মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল, মাওলানা আবু মূসআব।

২) মাফহুমুল হাকিমিয়্যাহ, ড. শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ।

৩) তাহকীমুল কাওয়ানীন মিনাল কুফরীল আকবার, শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম। এই ফতোয়া শাইখের ফতোয়া সংকলনের ১২ তম খণ্ডের ২৮৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে।

৪) নেদায়ে তাওহীদ, আবু উমার আল-মুহাজির।

১) নিজেরা বিধান প্রণেতা হয়ে দাঁড়ানো। (সুরা শুরা: ২১)

২) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করা। (সুরা মায়েদা: ৪৪)

৩) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা। (সুরা মায়েদা: ৫১)

৪) আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত বিষয়কে 'হারাম' এবং হারামকৃত বিষয়কে 'হালাল' ঘোষণা করা। (সুরা তাওবা: ৩১)

৫) আল্লাহর বিধানের তুলনায় অন্য কোনো আইনকে প্রাধান্য দেওয়া, তাকে উত্তম ও অধিক কার্যকর জ্ঞান করা অথবা সমান মনে করা কিংবা তার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা বৈধ মনে করা। (সুরা মায়েদা: ৪৪, সুরা বাকারা: ২২, সুরা নিসা: ৬৫)

এগুলো ছাড়াও ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে একেক শাসকের মধ্যে একেক ধরণের ঈমানবিধ্বংসী কাজ পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। আর এ ব্যাপারে আলেমগণের সর্বসম্মত মত হলো: যখন কোনো মুসলমান শাসক মুরতাদে পরিণত হয়, তখন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা ও তার বিরুদ্ধে কিতাল করা সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই, এমন শাসকের অধীনে পরিচালিত রাষ্ট্র ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে 'দারুল কুফর' বা কুফরের রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই এ ধরণের রাষ্ট্রে বন্দী মুসলমান এবং কাফের-মুশরিকদের হাতে বন্দী মুসলমানের বিধান এক।

ইতিহাস থেকে বন্দী মুক্তির খণ্ডচিত্র

১) ইমরান বিন হুসাইন (রাদি.) হতে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ (সা.) একজন মুশরিক বন্দীর বিনিময়ে দু'জন মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করে আনলেন।"[60]

২) ইবনু হিশাম বলেন, মদীনায় অবস্থানকালে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন: "আমার জন্য কে 'আইয়াশ বিন আবি রাবী'আহ এবং হিশাম বিন 'আসী এর দায়িত্ব নেবে?"

জবাবে ওয়ালিদ ইবন ওয়ালিদ বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি তাদের ব্যাপারে।" তারপর তিনি মক্কায় গোপনে প্রবেশ করলেন। পথে এক নারীকে দেখলেন যিনি খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "আল্লাহর বান্দি! কোথায় যাচ্ছ?"

নারীটি বলল: "আমি ঐ দুই বন্দীর কাছে যাচ্ছি"—সে 'আইয়াশ ও হিশামকে বোঝাচ্ছিল। তিনি তাকে অনুসরণ করে বন্দীদের অবস্থান জেনে নিলেন। তারা এমন একটি ঘরে আটক ছিল, যার ছাদ ছিল না। রাত হতেই তিনি দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকলেন, একটি মারওয়া পাথর এনে তাদের শৃঙ্খলের নিচে রাখলেন, তারপর নিজের তরবারি দিয়ে তা কেটে ফেললেন। এ কারণে তাঁর তরবারির নাম রাখা হয় 'যুল মারওয়া'। তিনি তাঁদের উটে তুলে নিয়ে চলতে লাগলেন। পথে উট

---

[60] সুনানে তিরমিজি: ১৫৬৮। সহিহ।

হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে তাঁর একটি আঙুল কেটে রক্ত বের হয়ে যায়। তখন তিনি এই কবিতার পঙক্তি উচ্চারণ করলেন:

“তুমি তো কেবল একটি রক্তাক্ত আঙুল,

কি সৌভাগ্য তোমার, আল্লাহর রাস্তায় তুমি আহত হয়েছ”

অবশেষে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছালেন।[61]

৩) ‘আমর বিন শু’আইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন: “একজন লোক ছিল, তাঁর নাম মারসাদ বিন আবি মারসাদ। তিনি মক্কায় বন্দী মুসলিমদেরকে গোপনে মুক্ত করে মদীনায় নিয়ে আসতেন। মক্কায় ‘আনাক নামী এক দুশ্চরিত্রা নারী ছিল, যে এক সময় তাঁর বন্ধু ছিল। তিনি মক্কার এক বন্দীকে কথা দিয়েছিলেন যে, তাকে মুক্ত করে মদীনায় নিয়ে যাবেন। মারসাদ বলেন, “একবার পূর্ণিমার রাতে আমি মক্কার এক বাগানের প্রাচীরের পাশে পৌঁছুলাম। সেই সময় ‘আনাক সেখানে এল এবং আমার ছায়া দেখে চিনে ফেলল। জিজ্ঞাসা করল: “তুমি কি মারসাদ?” আমি বললাম: “হ্যাঁ, আমি মারসাদ।”

আনাক বলল: “আসো, আজ রাতটা আমাদের সঙ্গে কাটাও।”

আমি বললাম: “আল্লাহ তা’আলা ব্যভিচার হারাম করেছেন, হে আনাক!” ‘আনাক তখন চিৎকার করে বলল: “এই লোকটাই আমাদের বন্দীদের মদীনায় নিয়ে যায়!” এ কথা শুনে আটজন লোক আমার পিছু নেয়। তখন আমি ‘খানদামা’ নামের এক পথ দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে এক গুহায় আশ্রয় নিলাম। তারা আমার মাথার ওপর এসে দাঁড়ায় এবং প্রস্রাব করে—যার কিছু আমার মাথায় পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তাদের দৃষ্টি থেকে আমাকে লুকিয়ে রাখেন। তারা ফিরে গেলে আমি সেই বন্দীর কাছে ফিরে গেলাম। কিন্তু উনি ছিলেন অনেক মোটা দেহের অধিকারী, তবুও আমি

[61] আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ লি ইবনি হিশাম, ১/৪১৬।

তাকে বহন করে 'ইযখির' এলাকায় নিয়ে গিয়ে শিকল খুলে দিলাম। তারপর অনেক কষ্টে তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে মদীনায় পৌঁছালাম।"[62]

৪) আবু রাফি' (রহ.) বলেন, একবার হজরত উমর (রাদি.) রোমের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। সে দলে ছিলেন সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা (রাদি.)। রোমানরা তাঁকে বন্দী করে তাদের বাদশাহর কাছে নিয়ে যায়। তারা বলে, "এই লোক মুহাম্মদের সাহাবি।" তখন সেই বাদশাহ তাঁকে বলল, "তুমি যদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করো, তবে তোমাকে আমার রাজত্ব ও ক্ষমতায় অংশীদার করব।"

আব্দুল্লাহ (রাদি.) দৃঢ়ভাবে বললেন, "তুমি যদি আমাকে তোমার সব সম্পদ, এমনকি আরবদের সবকিছুও দাও, তারপরও আমি মুহাম্মদের দ্বীন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ফিরে যাব না।" তখন বাদশাহ হুমকি দিয়ে বলল, "তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।" তিনি বললেন, "তুমি যা খুশি করতে পার।"

এরপর তাঁকে শূলে চড়ানো হলো এবং রোমান তীরন্দাজদের আদেশ দেওয়া হলো তাঁর হাত-পায়ের কাছে তীর ছুড়তে। বারবার তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে বলা হচ্ছিল, কিন্তু তিনি সবসময় অস্বীকার করছিলেন। তাকে নিচে নামিয়ে আনা হলো। পরে একটি পাত্রে পানি ঢেলে জ্বাল দেওয়া হলো, যতক্ষণ না তা ফুটে ওঠে। এরপর দুজন মুসলিম বন্দীকে আনা হলো, এবং তাদের একজনকে ঐ ফুটন্ত পাত্রে ফেলে দেওয়া হল। তারপর আবার তাকে একই প্রস্তাব দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি আবার অস্বীকৃতি জানালেনন। যখন তাকে সেই পাত্রে ফেলে দেয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়, তখন তিনি হঠাৎ কেঁদে ফেলেন। সবাই ভাবল, তিনি ভয় পেয়েছেন। কিন্তু যখন তাঁকে আবার প্রস্তাব দেওয়া হলো, তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করলেন।

---

[62] জামি'উল উসুল ফি আহাদিসির রাসুল লি ইবনিল আছির, ২/২৪৫, সুনানে তিরমিজি: ৩১৭৭। হাসান।

জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, "আমি কাঁদছিলাম এই কারণে—আমার তো শুধু একটি জীবন, আমি চাইছিলাম আমার শরীরের প্রতিটি লোমের বদলে একটি করে জীবন থাকত, আর সবই আমি আল্লাহর রাহে এইভাবে উৎসর্গ করতাম।"

তখন রোমান বাদশাহ বলল, "তুমি যদি আমার মাথায় চুমু দাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব।" আব্দুল্লাহ বললেন, "আমার সাথে সকল মুসলিম বন্দীকেও ছেরে দিবে?" বাদশাহ বলল, "হ্যাঁ।" তখন আব্দুল্লাহ (রা.) ভাবলেন, "আল্লাহর শত্রুর মাথায় চুমু খেয়ে যদি আমি এবং অন্য মুসলিমরা মুক্তি পাই, তাহলে আমি প্রস্তুত।" তিনি গিয়ে মাথায় চুমু দেন এবং বাদশাহ সবাইকে মুক্তি দেন।

আব্দুল্লাহ (রা.) বন্দীদের নিয়ে হজরত উমরের (রা.) কাছে ফেরত আসেন এবং সবকিছু বলেন। তখন হজরত উমর (রা.) বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফার মাথায় চুমু খাওয়া। আমি শুরু করছি।" এরপর তিনি নিজেই গিয়ে তাঁর মাথায় চুমু খান।[63]

৫) বকর বিন খুনাইস বর্ণনা করেন, খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (রাহি.) কনস্টান্টিনোপলের বন্দী মুসলমানদের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে বলেন: "তোমরা নিজেদের বন্দী মনে করছ—মাআযাল্লাহ! তোমরা তো আল্লাহর রাস্তায় আটকে পড়া (মহান) লোক। জেনে রাখো, আমি যখন আমার প্রজাদের মাঝে কিছু বণ্টন করি, তখন তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সর্বাধিক এবং উৎকৃষ্ট অংশ দিয়ে থাকি।

এখন আমি তোমাদের জন্য পাঁচ দিনার করে পাঠাচ্ছি। আর আমার যদি আশংকা না হত যে রোমের বাদশা তা আটকে না দিবে, তবে আমি আরও বেশি পাঠাতাম। আমি অমুকের পুত্র অমুককে পাঠিয়েছি, সে তোমাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, দাস-

[63] তারীখে দিমাশক লি ইবনি 'আসাকির, ২৭/৩৫৮, আলিসাবাহ ফি তামঈজিস সাহাবা, ৪/৫২।

স্বাধীন—সবার মুক্তির জন্য চুক্তি করবেন। অতএব আনন্দিত হও, সুসংবাদ গ্রহণ করো। আসসালামু আলাইকুম।”[64]

৬) ১৩৯ হিজরিতে খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর রোমানদের সঙ্গে বন্দী বিনিময়ের চুক্তি করেন। এর মাধ্যমে তিনি রোমানদের কাছ থেকে সকল মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করে আনেন। এই ঘটনার পর ১৪৬ হিজরি পর্যন্ত মুসলিমদের পক্ষ থেকে আর কোনো গ্রীষ্মকালীন সামরিক অভিযান চালানো হয়নি।[65]

৭) “আর সে বছর খলিফা হারুন আর-রশীদ রোমে বন্দী থাকা সব মুসলিমকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করেন। বলা হয়, এরপর সেখানে আর কোনো মুসলিম বন্দী অবশিষ্ট ছিল না। তখন এক কবি বলেছিলেন:

আপনার মাধ্যমে সুদৃঢ় কারাগারের বন্দীরাও মুক্তি পায়,

যেখানে তাদের সাক্ষাতে প্রিয়জনেরাও আসে নি হায়!

যখন মুসলমানরা তাদের মুক্ত করতে ছিল অক্ষম,

বলা হত, মুশরিকদের জেলখানাই তাদের মৃত্যুযম!”[66]

৮) সেই বছর মুসলিম ও রোমক খ্রিষ্টানদের মধ্যে বন্দী বিনিময় হয়। এর আগে রোমের রাণী তাদুরা বারো হাজার মুসলিম বন্দীকে হত্যা করেছিল। সে বন্দীদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে আহ্বান করেছিল—যারা গ্রহণ করেছিল, তাদের আগের খ্রিষ্টান বন্দীদের মতোই বিবেচনা করা হয়; আর যারা অস্বীকৃতি জানায়, তাদের হত্যা করা হয়। এরপর সে অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তিপণের প্রস্তাব পাঠায়।

---

[64] সিরাতু উমর বিন আব্দুল আজিজ ‘আলা মা রাওয়াহুল ইমাম মালিক বিন আনাস ওয়া আসহাবুহু লি ইবনি আব্দিল হাকাম, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

[65] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব, ১/৭১।

[66] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/৬৬৮।

খলিফা মুতাওয়াক্কিল তখন তার খাদিম শুনাইফ-কে এই দায়িত্বে পাঠান। প্রধান বিচারপতি জাফর ইবন আব্দুল ওয়াহিদ মুক্তিপণ প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকতে চান এবং তার পরিবর্তে বিচারপতির দায়িত্বে কাউকে নিযুক্ত করার অনুমতি চান। তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ইবনু আবি শাওয়ারিব নামের এক যুবককে দায়িত্ব দিয়ে মুক্তিপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিপণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয় লামিস নদীর তীরে। এতে ৭৮৫ জন পুরুষ ও ১২৫ জন নারী মুসলিম বন্দী মুক্তি পায়।[67]

৯) এ সময় রোমের বাদশাহ খলিফার কাছে একটি পত্র পাঠালেন, যাতে তিনি অনুরোধ করেন: "রাহার এক গির্জায় আছে এমন একটি রুমাল, যা নাকি ঈসা (আ.) তাঁর মুখ মোছার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, এবং তাতে তাঁর মুখমণ্ডলের ছাপ পড়ে গেছে। আপনি যদি সেই রুমাল আমাকে পাঠান, তাহলে আমি বিপুলসংখ্যক মুসলিম বন্দী মুক্ত করে দেব।"

খলিফা আলেমদের ডেকে পরামর্শ নিলেন। কেউ কেউ বললেন, "আমরাই তো ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী। সেই রুমাল দেওয়া মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশক এবং আমাদের ধর্মীয় দিক থেকে মানহানীকর।"

তখন মন্ত্রী আলী বিন ঈসা বললেন: "হে আমিরুল মুমিনিন, কাফিরদের হাতে থাকা মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা, সেই রুমাল গির্জায় রেখে দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মুসলমানদের জন্য উপকারি।" খলিফা এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং রুমাল পাঠিয়ে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন।[68]

১০) এই বছর জিলক্বদ মাসে মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে বন্দী বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এ দায়িত্ব পালন করেন ইবনু ওরকা আশ-শাইবানী। মোট ছয় হাজার তিনশ

---

[67] আল-কামিল ফিত তারীখ লি ইবনিল আসির আল-জাযারী, ৬/১৫০।

[68] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/২০৬।

জন মুসলিম বন্দী—নারী ও পুরুষ মিলিয়ে—মুক্তি পান। মুক্তিপণ আদান-প্রদানের এ ঘটনাটি বাদনদুন নদীর তীরে সম্পন্ন হয়।[69]

১১) শাইখ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আব্দুস সালাম, যিনি 'ইবনুল হুবলী' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি নেককার লোকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি প্রায়ই আক্কা শহরে যেতেন মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্য, যখন সেখানে ক্রুসেডারদের শাসন চলছিল। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন, জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করুন এবং আপন অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।[70]

১২) এই বছর সাইফুদ্দৌলা সঙ্গে রোমানদের বন্দী বিনিময় হয়। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আবু ফিরাসসহ অনেককে মুক্ত করেন। সাইফুদ্দৌলা তাঁর নিকট বন্দী রোমান সৈন্যদের নিয়ে বন্দী বিনিময়ের জন্য রওনা হন এবং তাদের বিনিময়ে তিনি মুক্ত করেন তাঁর চাচাতো ভাই আবু ফিরাস, তাঁর একজন দাস, রুতাস নামী এক লোককে এবং হালব ও হিমস শহরের বহু সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে।

যখন তাঁর নিকট থাকা রোমান বন্দীদের আর কেউ অবশিষ্ট থাকল না, তখন তিনি মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করতে শুরু করেন—প্রত্যেকের বিনিময়ে ৭২ দিনার করে দিয়ে। সব অর্থ শেষ হয়ে গেলে তিনি তাঁর অমূল্য রত্নখচিত বাহন বন্ধক দিয়ে অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্ত করেন। অবশেষে, যখন আর কোনো মুসলিম বন্দী বাকি থাকল না, তখন তিনি রোমান রাজা তকফুর-এর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। এটি ছিল সাইফুদ্দৌলার মহান কাজগুলির একটি।[71]

১৩) বিচারক জামালুদ্দীন ইবন শীছ লিখেছেন—তিনি নিজে যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা এইভাবে বর্ণনা করেন: কাজী আল-ফাদ্বিল (রাহি.)-এর মিসরে একটি বিরাট

---

[69] আল-কামিল ফিত তারীখ লি ইবনিল আসির আল-জাযারী, ৭/৭৭।

[70] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৮/৩৮।

[71] তারীখু ইবনুল ওয়ারদি, ১/২৮২।

বাড়ি ছিল, যেটি থেকে প্রচুর টাকা আয় হতো। যখন তিনি হজের জন্য রওনা হলেন, তখন রাস্তায় সেই বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় থেমে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর কাছে বললেন: "হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, এই ভবনটি আমার সবচেয়ে প্রিয় ও মহব্বতের সম্পদ। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, আমি এটি মুসলিম বন্দীদের মুক্তির জন্য ওয়াকফ করে দিলাম।"

এই ঘোষণা দিয়ে তিনি হজযাত্রায় রওনা হলেন। আজও সেই ওয়াকফ বহাল রয়েছে। আমার ধারণা—এটিই সেই বিখ্যাত মিসরের নদীতীরবর্তী খেজুর শিল্পকেন্দ্র, যা এখনো জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আছে।[72]

১৪) রজব মাসের আট তারিখে কুবজক কাজীগণ ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে এনে গাযানের নেতৃত্বাধীন মাহমুদি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার শপথ করান। তারা সেই শপথ গ্রহণ করে। এদিনই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহি.) বুলাইয়ের শিবিরে মুসলিম বন্দীদের মুক্তির জন্য উপস্থিত হন। অনেক বন্দীকে তিনি কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করে আনেন। তিন দিন সেখানে কাটিয়ে পরে তিনি ফিরে আসেন।[73]

১৫) এরপর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রাহি.) শক্তিসামর্থ নিয়ে বায়তুল মাকদিসের দিকে রওনা হন এবং রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে শহরের পশ্চিম পাশে ঘাঁটি গাড়েন। তখন শহরে ষাট হাজার ক্রুসেডার সৈন্য অবস্থান করছিল। মুসলিম বাহিনী তাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। পাঁচ দিন পর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রাহি.) শহরের উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মানজানিক (পাথর নিক্ষেপনকারী মেশিন) স্থাপন করেন এবং তীব্র আক্রমণ শুরু হয়। তখন খ্রিষ্টানরা নিরাপত্তা চাইলে, প্রথমে কিছুটা অনীহা প্রকাশের পর তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

---

[72] আল-ওয়াফী বিল ওয়াফিয়্যাত লি সালাহউদ্দীন সাফাদী, ১৮/২০৭।

[73] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/১০।

প্রত্যেক পুরুষের জন্য দশ দিনার, নারীর জন্য পাঁচ এবং শিশুদের জন্য দুই দিনার মুক্তিপণ ধার্য হয়। যারা অর্থ দিতে অক্ষম, তাদের চল্লিশ দিন সময় দেওয়া হয়—তারপর তাদের দাস বানিয়ে দেয়া হবে। ক্রুসেডাররা এতে রাজি হয়। সর্বমোট সাত লাখ দিনার সংগ্রহ করা হয়, যা সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করা হয়। ত্রিশ হাজার লোক মুক্তিপণ দিতে পারেনি, তাই তাদের দাস বানিয়ে বণ্টন করে দেয়া হয়। পাশাপাশি বিশ হাজার মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা হয়।[74]

১৬) ইতিহাসবিদ কিফতীর লেখায় পাওয়া যায় যে, সেলজুক সুলতান আলপ আরসালান যুদ্ধের আগে আল্লাহর দরবারে গভীরভাবে দোয়া করেন, নিজেকে বিনীতভাবে নিবেদন করেন। আর সেই খ্রিষ্টান শাসকের বন্দী হওয়ার ঘটনা ছিল এরকম—এক দাস (গোলাম) এক ঘোড়ায় অলংকৃত লাগাম ও সোনালি আসনসহ এক ব্যক্তিকে দেখে। সেই পরনে সোনার হেলমেট ও সোনায় মোড়া বর্ম। তখন সেই গোলাম লোকটিকে ধরে এনে সুলতানের সামনে হাজির করে।

সুলতান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, “ধ্বংস হো তুই! আমি তো তোকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ভুলে গেছিস?” লোকটি হতাশ মুখে বলল, “অনুগ্রহ করে তিরস্কার করবেন না।”

সুলতান তখন জিজ্ঞেস করলেন, “যদি তুই আমাকে বন্দী করতে পারতি, কী করতি?” উত্তর এলো, “খুব নিকৃষ্ট কিছু।” সুলতান আবার বললেন, “তাহলে তুই এখন কী আশা করিস?”

সে বলল, “হয় মেরে ফেলবে, নয়তো আমাকে তোমার দেশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অপমান করবে। আর যদি মর্জি হয়, তাহলে মুক্তিপণ নিয়ে ক্ষমা করে মুক্তি দিবে—যদিও এটা অনেক অসম্ভব।” সুলতান বলেন, “আমি এটাই ঠিক করেছি।”

---

[74] তারীখুল ইসলাম লিয যাহাবী, ৪১/২৪ (বায়তুল মাকদিস বিজয়ের ঘটনা)।

অতঃপর সেই রাজা নিজেকে ১৫ লক্ষ দিনার দিয়ে মুক্ত করেন, এবং তার দেশে থাকা সকল মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তারপর তাকে এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিদায় দেন এবং পথের খরচও দেন।[75]

১৭) রমাদান মাসে কিছু মুসলিম বন্দী ফিরে আসে, যারা খ্রিষ্টান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এসেছিল। তাদের রাখা হয় 'আল-মাদরাসাতুল আদিলিয়্যাতুল কাবিরাহ'তে। প্রায় ষাট হাজার মুদ্রার বিনিময়ে তাদের মুক্ত করা হয় বন্দী মুক্তিকরণ মন্ত্রণালয় থেকে। এ ঘটনায় যারা ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদের জন্য অনেক দোয়া করা হয়।[76]

১৮) মুহাম্মদ (আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ, আল-মুতাসিম বিল্লাহ) ছিলেন আলাউই বংশের গুণী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। ফিকহে মালিকি হলেও আকিদায় ছিলেন হাম্বলী। তিনিই প্রথম আলাউই রাজা যিনি মারাকেশকে রাজধানী করেন। পিতার জীবদ্দশায় শহরটির শাসক ছিলেন ও বহু উন্নয়ন করেন। ১১৭১ হিজরিতে সিংহাসনে বসেন, তখন রাষ্ট্র বিশৃঙ্খল ছিল—তিনি তা নিয়ন্ত্রণে আনেন।

তিনি ফাস, মাকনাস, তেতোয়ান, তাঞ্জা, সেবতা, সলা ও রিবাতুল ফাতহ সফর করে দুর্গ নির্মাণ ও জাহাজ তৈরির নির্দেশ দেন। ১১৭৫ হিজরিতে সাহারায় বিদ্রোহী গোত্র দমন করেন এবং সুয়াইরা শহর প্রতিষ্ঠা করেন।

সমুদ্র জিহাদের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি যুদ্ধজাহাজ ও নৌদল গঠন করেন। তাঁর শাসনামলে ফরাসিরা সলা ও আরায়েশ-এ হামলা চালালেও তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়, মুহাম্মদ সেগুলিকে মজবুত করেন। তিনি জাদিদা শহর আক্রমণ করে ১১৮২ হিজরিতে পর্তুগিজদের থেকে মুক্ত করেন, এবং উপকূলীয় শহরগুলোতে শক্তিশালী সৈন্য ও কামান মোতায়েন করেন।

---

[75] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৮/৪১৬।

[76] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৮/২৮০।

তিনি রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে কাজ করেন—নগর, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েন, নৌ-সেনার জন্য বহু জাহাজ তৈরি করেন, এবং ৪৮,০০০ মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। ইউরোপীয় রাজারা তাঁকে শ্রদ্ধা করত, এবং উপহারসমেত প্রতিনিধি পাঠাত।[77]

১৯) শাইখ উসামা (রাহি.) সাংগঠনিক সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। আমি কাছ থেকে দেখেছি, শাইখ উমর আব্দুর রহমান (রাহি.)-এর মুক্তির জন্য তিনি কীভাবে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতেন। একাধিকবার এই ইস্যুতে আলোচনা করেছেন, এমনকি একটি বিশেষ কনফারেন্সও আয়োজন করেছিলেন, যেখানে বিভিন্ন সংগঠনের ভাইয়েরা অংশগ্রহণ করেন।

একবার কয়েকজন ভাই শাইখ উমরের মুক্তির জন্য শাইখ উসামার সহযোগিতা চাইলেন। আমি তাদের নিয়ে শাইখের নিকট পৌঁছাই—জালালাবাদের নিকট একটি উপত্যকায়, মুজাহিদদের ঘাঁটিবেষ্টিত একটি শান্ত নদীর ধারে। সেখানেই শাইখ একসময় ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন: "আমেরিকা ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা লাভ করবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ফিলিস্তিনে নিরাপত্তা লাভ করি।।"

আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। শাইখ বললেন, "আমি এই কাজের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। যদি কোনো ঘাটতি থেকে থাকে, জানাও—আমি তা পূরণ করবো।" ভাইয়েরা বললেন, "না শাইখ, আপনি কোনো ঘাটতি রাখেননি, আমরা বরং আপনাকে সহযোগিতা করতে চাই।"

আল্লাহর অনুগ্রহে, আমরা আমেরিকান ইহুদি ওয়ার্ন আইনস্টাইনকে বন্দী করতে সক্ষম হই এবং তার বিনিময়ে যেসব শর্ত দিই, তার মধ্যে অন্যতম ছিল: শাইখ উমর আব্দুর রহমানের মুক্তি ও নিরাপদে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আরও শর্ত ছিল বোন আফিয়া সিদ্দীকা, শাইখ আবু হামজাসহসহ আল-কায়েদার সাথে

---

[77] আল-আ'লাম লি খাইরুদ্দীন যিরিকলী, ৬/২৪১।

সম্পৃক্ত বন্দীদের মুক্তি। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন শাইখ উমরের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করেন এবং সকল মুসলিম বন্দীকেই মুক্তির নেয়ামত দান করেন।[78]

২০) ২০১৪ সালের জুন মাসে কাতারের মধ্যস্থতায় তালেবান ও আমেরিকার মধ্যে বন্দী বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ২০০৯ সালের জুন থেকে তালেবানের হাতে বন্দী একজন মার্কিন সৈন্যকে তারা নিজেদের পাঁচজন উচ্চপদস্থ সদস্যের বিনিময়ে মুক্তি দেয়।

যারা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আমেরিকার কুখ্যাত জেল, গুয়ান্তানামো বে-তে দীর্ঘদিন ধরে বন্দী ছিলেন। তারা হলেন মোহাম্মদ ফজল, মোল্লা নুরুল্লা নূরী, মোহাম্মদ নবী, খাইরুল্লাহ খাইরখোয়া এবং আব্দুল হক ওয়াসিক।[79]

২১) ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে তালেবান ও মার্কিন মদদপুষ্ট আফগান সরকারের মধ্য একটি বন্দী বিনিময় চুক্তি হয়। সেখানে তালেবানের হাতে বন্দী মার্কিন নাগরিক কেভিন কিং এবং অস্ট্রেলীয় নাগরিক টিমোথি উইকসকে মুক্তি দেয়া হয় তিনজন তালেবান সদস্যের বিনিময়ে। উক্ত দুই বন্দীর বিনিময়ে আফগান সরকার তালেবানের তিন শীর্ষ নেতা—আনাস হক্কানি, হাজি মালি খান ও হাফিজ রশিদ—কে মুক্তি দিয়েছে। আনাস হাক্কানি হলেন তালেবানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও হাক্কানি নেটওয়ার্কের প্রধান সিরাজউদ্দিন হাক্কানির ছোট ভাই।[80]

২২) ২০১১ সালের অক্টোবরে সন্ত্রাসী ও দখলদার ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক বন্দী বিনিময় চুক্তি সম্পন্ন হয়, যার মাধ্যমে ইসরায়েলি সৈন্য গিলাদ শালিতকে মুক্তি দেওয়া হয়। সে ২০০৬ সাল থেকে গাজায় হামাসের হাতে

---

[78] ইমামের সাথে অতিহাভিত দিনগুলো (পর্ব-২), শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরি রাহি., ২ পৃষ্ঠা। (সংক্ষেপিত)

[79] https://tinyurl.com/2en7fjju

[80] https://tinyurl.com/2tf3jput

বন্দী ছিল। বিনিময়ে, ইসরায়েল দুইধাপে এক হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। যেখানে ২৭ জন মহিলাও ছিল। এই চুক্তি মিশরের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হয়। ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি গাজা ও পশ্চিম তীরে উদযাপনের কারণ হয়ে ওঠে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ মিছিল করে।[81]

২৩) ২০২১ সালের ৫ মার্চ, সোমালিয়ার আধা-স্বায়ত্তশাসিত পুন্টল্যান্ড রাজ্যের বোসাসো শহরের প্রধান কারাগারে ইসলামী সংগঠন হারাকাতুশ শাবাব (আশ শাবাব) আক্রমণ চালায়। এই হামলায় কমপক্ষে সাতজন সৈনিক নিহত হয়। আশ-শাবাব এক বিবৃতিতে বলে, তারা ৪০০-এর বেশি বন্দীকে মুক্ত করেছে, যাদের মধ্যে অনেকে তাদের সংগঠনের সদস্য এবং দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাবন্দী ছিল। কারাগারের প্রহরী মোহাম্মদ আব্দি জানান, ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করে এবং বিস্ফোরণের মাধ্যমে কারাগারে প্রবেশ করে বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে যায়।[82]

---

[81] https://tinyurl.com/4knm9t3h

[82] https://tinyurl.com/2uyteebz

বন্দী মুক্তির ব্যাপারে উদাসীনতা ও তার পরিণতি

ইতিপূর্বে আমরা কুরআন-সুন্নাহ এবং উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উপর একটি ওয়াজিব দায়িত্ব। এই গুরুতর দায়িত্বে উদাসীনতা ও অবহেলা করলে শুধু ওয়াজিব তরকের গোনাহই নয়, বরং অবহেলাকারীরা আরও ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে পারে—পার্থিব জীবনেও, আখেরাতেও।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إنما المؤمنون إخوة

"নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই-ভাই।" (সুরা হুজুরাত: ১০)

আরেক আয়াতে বলেছেন:

والمؤمنون والمؤنات بعضهم أولياء بعض

"আর মুমিন পুরুষরা এবং নারীরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।" (সুরা তাওবা: ৭১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

المسلم أخو المسلم لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং তাকে জালিমের হাতে ছেড়েও দেয় না।"[83]

[83] সহিহ বুখারী: ২৪৪২।

খেয়াল করলে দেখবেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুল (সা.) এখানে মুসলমানদের পরস্পরের দায়িত্বশীলতার কথা বলেছেন। কোথাও বলেছেন মুসলমানরা পরস্পর ভাই অর্থাৎ ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের যেভাবে ভালোবাসা ও দায়িত্ব থাকে, সেভাবেই মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ব থাকা উচিত। আবার কোথাও বলেছেন মুমিনরা পরস্পর বন্ধু, অর্থাৎ এক বন্ধু যেভাবে অপরের খেয়াল রাখে, সুখদুঃখ ভাগ করে নেয়; মুসলমানদের সেভাবেই হওয়া উচিত।

এখন যদি আমরা অপর মুসলমানের প্রতি ভাই ও বন্ধু সুলভ আচরণ না করি, তাদের ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা প্রদর্শন করি, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভাষায় আমরা সেরকম মুসলমান হতে পারি নি, যাদের বৈশিষ্ট্য উক্ত আয়াত-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে মূলত প্রকৃত মুমিন ও মুসলমানের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে পরিপূর্ণরূপে অনুগত। যা উল্লিখিত হাদিসের শেষাংশ দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। যেখানে রাসুল (সা.) বলেছেন: “যে তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং তাকে জালিমের হাতে ছেড়ে দেয় না।” ‘ভাইয়ের উপর জুলুম করে না’ এটা সহজে বুঝা গেলেও ‘তাকে জালিমের হাতে ছেড়ে দেয় না’ এই বাক্যটি একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

কারণ এখানে একথা যেভাবে বলে হচ্ছে ‘তাকে জালিমের হাতে ছেড়ে দেয় না বা তুলে দেয় না’ সেভাবে এই কথাও পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে যে, কোনো মুসলমান যদি মাজলুম হয় তাহলে তাকে সাহায্য না করে থাকতে পারে না অপর মুসলমান ভাই। আর এই কথার সমর্থনে আরেকটি হাদিসও পাওয়া যায়, যেখানে রাসুল (সা.) বলেন:

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولايخذله ولايحقره

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং তাকে অসহযোগিতা করে না এবং তাকে অপদস্থ বা তুচ্ছজ্ঞান করে না।"[84]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রাহি.) বলেন: "আলেমগণ বলেন, 'লা ইয়াখযুলুহু' মানে হলো তাকে সাহায্য সহযোগিতা না করা। অর্থাৎ যদি কেউ কোনো অনিষ্ট বা জুলুম থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তার নিকট সাহায্য চায়, তাহলে সাহায্য করা তার উপর ওয়াজিব; যদি সে সক্ষম হয় এবং তাতে শরিয়তসম্মত কোনো বাধা না থাকে।"[85]

ইমাম আহমদ (রাহি.) একটি হাদিস বর্ণনা করেন, যেখানে রাসুল (সা.) বলেন:

من أُذلَّ عنده مؤمنٌ فلم ينصرْه وهو يقدر على أن ينصرَه أذلَّه اللهُ على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ

"যার সামনে কোনো মুমিনকে অপমান করা হলো, অথচ সে— সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও— সাহায্য করল না, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তাকে সবার সামনে অপমানিত করবেন।"[86]

এখানে রাসুল (সা.) মুসলমানের মৌলিক কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন, যারা নিজেদের প্রকৃত মুসলমান দাবী করেন অথচ এই গুণগুলি নিজের মধ্য অনুপস্থিত, তাদের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত।

কারণ হাদিসে সকল মুমিনকে এক দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে দেহের এক অংশ আক্রান্ত হলে ব্যথা পুরো দেহ অনুভব করে। কেউ যদি অপর মুমিনের দুঃখকষ্ট দেখার পরেও তার দুঃখ অনুভব না করে, সহমর্মিতা প্রদর্শন না

---

[84] সহিহ মুসলিম: ৬৪৩৫।

[85] শরহু মুসলিম, ১৬/১২০।

[86] মুসনাদে আহমাদ: ১৫৯৮৫। কেউ কেউ এ হাদিসকে 'দুর্বল' বলেছেন। তবে ইমাম শাওকানী সহিহ বলেছেন। ইমাম সুয়ুতি 'হাসান' বলেছেন, ইমাম হাইছামীর কথা থেকেও বুঝা যায় এটি হাসান স্তরের হাদিস।

করে এবং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে সাহায্য না করে, তাহলে হাদিসের ভাষায় সে প্রকৃত মুমিনই নয়। কারণ মুমিনরা পরস্পর বন্ধু ও অভিভাবক।

আর স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি আজ অন্যের বিপদে এগিয়ে না আসেন, আগামীকাল আপনার বিপদে আরেকজন এগিয়ে আসবে না। একটি প্রবাদ আছে, ‘যেমন কর্ম, তেমন ফল’। আজ যা করবেন আপনি, কাল সেটারই পুনরাবৃত্তি হবে আপনার সাথে। আর এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

যেমন সত্তরের দশকের শেষদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে হামলার পূর্বে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও বুখারা, সমরকন্দসহ বিভিন্ন ইসলামী ভূখণ্ডে হামলা করে। আফগানিস্তান তাদের নিকটে থাকা সত্ত্বেও তাদের সাহায্য করে নি, তারা হয়তো ভেবেছিল তাদের কেউ আক্রমণ করবে না, তারা পাহাড় বেষ্টিত অঞ্চলে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু সোভিয়েত সেখানে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করার পঞ্চাশ বছরের মাথায় আফগানিস্তানের উপর আরো বর্বর ও নিষ্ঠুর হামলা করে বসে।

এমনিভাবে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশে যখন ‘উগ্রপন্থা বিরোধী অভিযান’ নামে ইসলামপন্থীদের গ্রেফতার করা হচ্ছিল, সত্যবাদী আলেম ও দাঈদের আটক করা হচ্ছিল, তখন জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা কোনো বিরোধিতা তো করে নি, বরং আরো সাহায্য করেছে নিরপরাধ ইসলামপন্থীদের আটক ও গ্রেফতারে। কিন্তু তার কয়েক বছরের মাথায় আওয়ামী লীগ তাদেরই গ্রেফতার করতে শুরু করে। এমনকি এক সময় তাদের সকল শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করে ফেলে।

এই মর্মে ইমাম আবু দাউদও একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেখানে রাসুল (সা.) বলেছেন:

ما من امرئٍ يخذلُ امرأً مسلمًا في موضعٍ تُنتهك فيه حُرمتُه ويُنتقَص فيه من عِرضه، إلا خذله الله في موطنٍ يُحب فيه نصرته، وما من امرئٍ ينصر مسلمًا في

موضعٍ يُنتقَص فيه من عِرضه ويُنتهك فيه من حُرمته، إلا نصره الله في موطنٍ يُحب فيه نصرته

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন স্থানে সাহায্য বঞ্চিত করে—যেখানে তার সম্মানহানী হচ্ছে, তার চরিত্রে আঘাত আসছে—তাকে আল্লাহ এমন স্থানে সাহায্য বঞ্চিত করবেন, যেখানে সে খুব করে সাহায্য প্রত্যাশা করবে। আর যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের পাশে দাঁড়ায়, তার ইজ্জত ও সম্মান রক্ষায় সহযোগিতা করে, আল্লাহ তাকে সেখানে সাহায্য করবেন—যেখানে তার সবচেয়ে বেশি সাহায্যের প্রয়োজন হবে।”[87]

আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَـٰنُ، ارْحَمُوا مَن فِي الْأَرْضِ، يَرْحَمْكُم مَّن فِي السَّمَاءِ

“দয়া প্রদর্শনকারীদের উপর সবচেয়ে বড় দয়াশীল (আল্লাহ তা’আলা) অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা জমিনবাসীদের উপর অনুগ্রহ করো, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করবেন।”[88]

এখানে স্পষ্টভাবে জমিনবাসীর উপর রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সবচেয়ে উত্তম জমিনবাসী হল মানুষ, আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানুষগুলির অন্যতম হল শুধুমাত্র দ্বীনের জন্য বন্দী ও গ্রেফতার হওয়া এই লোকগুলো। জালিমের অবর্ণনীয় জুলুম থেকে তাদের উদ্ধার ও মুক্ত করার চেয়ে বড় দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কী হতে পারে? এই কাজের বিনিময়ে আপনি পাবেন সবচেয়ে বড় দয়াশীল আল্লাহ তা’আলার দয়া ও রহমতের মত মূল্যাবান নিয়ামত!

---

[87] সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৮৪। যদিও হাদিসটির সনদ দুর্বল, কিন্তু এই হাদিসের ভাষ্য ও অন্যান্য হাদিসের ভাষ্যের সাথে মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায়, এর মর্ম সহিহ।

[88] সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৪১। সহিহ।

আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত এই হাদিসে মাজলুম মুসলমানকে সাহায্যের ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: "تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমার ভাইকে সাহায্য করো—সে জালিম হোক বা মাজলুম।" তখন একজন ব্যক্তি বলল: "হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো তাকে সাহায্য করি যখন সে মাজলুম হয়; কিন্তু সে যদি জালিম হয়, তখন কিভাবে সাহায্য করব?" তিনি (ﷺ) বললেন: "তুমি তাকে যুলুম করা থেকে নিবৃত রাখবে বা বাধা দেবে। এটাই তার প্রতি সাহায্য।"

এই হাদিসে জালিম মুসলমানকেও—তার জুলুম থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে—সাহায্য করতে বলা হয়েছে, আর মাজলুমের সাহায্যের কথা তো স্পষ্টভাবেই এসেছে। তাহলে রাসুল ﷺ-এর এমন সরাসরি নির্দেশনার পরও আমরা কীভাবে নির্লিপ্ত থাকতে পারি—মাজলুমদের সাহায্য না করে?

আল্লাহ তা'আলা রাসুলের নির্দেশ অমান্যকারী ও তার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শনকারীদের সম্পর্কে বলেন:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"সুতরাং যারা তাঁর (রাসুলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত—না জানি তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে।" (সুরা নুর: ৬৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের বিরোধিতা দুনিয়াতে বিপদ আপতিত হওয়া এবং আখিরাতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি

যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে বন্দী মুক্ত করেছেন এবং বন্দী মুক্তির বিষয়ে নির্দেশও দিয়েছেন। এমতাবস্থায়, কারো পক্ষে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বন্দী মুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা, বাস্তবিক অর্থেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর। আর এর পরিণতি হবে—দুনিয়াতে বিপদাপদ তাকে ঘিরে ধরবে এবং আখিরাতে সে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হবে।

তারা দিনের পর দিন শুধু দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের কারণে কারাগারের নির্মমতা, নিঃসঙ্গতা ও নির্যাতন সহ্য করছে। আমরা কি এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হব না? তাদের প্রতি কি আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই? তারা কি দ্বীনের বন্ধনে আমাদের ভাই নয়? নাকি আমরা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখি না? অথবা আমরা আখিরাতে মুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত কোনো সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি?

বিভিন্ন দেশের বন্দীদের নির্যাতনের কিছু চিত্র

এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন দেশে মুসলিম বন্দীদের উপর চালানো অমানবিক নির্যাতনের কিছু ঘটনা তুলে ধরব, যাতে পাঠক পৃথিবীর নানা প্রান্তে মুসলিমদের উপর চলা জুলুম ও নিপীড়নের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারে এবং মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি নিজের দায়িত্বে যে গাফলতি ও উদাসীনতা আছে, তা নিয়ে অন্তরে অনুশোচনা অনুভব করে।

মিসর

১) "এবার আমার দু'হাত পিছনে বাঁধা অবস্থায় আরও দু'জন কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্য আমাকে সামরিক কারাগারের নানা অংশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলো। আমি কারাগারের বিভিন্ন জায়গায় ইখওয়ানী ভাইদের উপর চালানো ভয়াবহ নির্যাতনের দৃশ্য দেখে আতকে উঠলাম। তাদের অনেককে কাপড় খুলে লোহার ফ্রেমের) সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে বেপরোয়াভাবে চাবুক মারা হচ্ছিল। চাবুকের ঘায়ে তাদের পিঠ ফেটে গিয়ে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ধারা বইছিল। আবার অনেকের ওপর হান্টার মারার পর ক্ষুধার্ত কুকুর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল। কুকুরের কামড়ে তাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল।

আমি দেখেছি—এই বন্দীদের মধ্যে যেমন তরুণ আছে, তেমনি রয়েছে মধ্যবয়সী, বৃদ্ধ, এমনকি ছোট ছোট কিশোর-কিশোরীরাও। কেউ কেউ আশি-নব্বই বছরের

বৃদ্ধ। কিন্তু সবার অবস্থাই এক—রক্তাক্ত শরীর, পিঠে চাবুকের দাগ, মুখে আঁচড়ের চিহ্ন, গায়ে ছেঁড়া একটিমাত্র কাপড়। যে কপাল কখনো আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে নত হয়নি, সেই কপাল থেকেও ঝরছে উষ্ণ রক্ত। তবুও কী আশ্চর্য! তাদের চোখ-মুখে এক অপার্থিব জ্যোতি—এক প্রশান্তি। কেউ শুলিতে ঝুলেও মুখে আল্লাহর নাম নিচ্ছে প্রশান্ত চিত্তে। কারো শরীর ছাদ থেকে উল্টো ঝুলছে, তবুও তারা ধৈর্য হারায়নি, সত্য বলায় পিছপা হয়নি। কিন্তু এমন ভয়াবহ দৃশ্য আর সহ্য হচ্ছিল না আমার। অসহ্য... অসহ্য... অসহ্য!”[89]

২) ২৪ বছর বয়সী চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল-ফাখরানি তার কারাগারের সঙ্গী খালেদ (ছদ্মনাম) - যিনি কোনো জিহাদী সংগঠনের সদস্য- সম্পর্কে বলেছেন যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার যৌনাঙ্গে বিদ্যুৎ শক দেওয়া হয়েছে এবং কাঠের লাঠি তার পায়ুপথে প্রবেশ করিয়ে যৌন নিপীড়ন করা হয়েছে। তদন্তকারীরা তাকে বলেছে, “যদি স্বীকারোক্তি না দাও, তাহলে তোমার মাকে ধর্ষণ করা হবে।”

বন্দীদের উপর শারীরিক আক্রমণ ও মারধর সেখানে যেন সাধারণ রীতি। নতুন বন্দীদের কারাগারে নিয়েই ‘তাশরিফা’ নামে একটি ‘অভ্যর্থনা’ অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলে মারধর, লাথি-ঘুষি এবং অপমানজনক আচরণ। বন্দীদের জোর করে নগ্ন করা হয় এবং সেনা, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালায়।

আল-ফাখরানি জানান, তিনি নিজ চোখে দেখেছেন তার এক বন্ধুর চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন, “ওকে এত মারধর করা হয়েছিল যে তার পুরো মুখ রক্তে ভরে গিয়েছিল এবং এক চোখ হারিয়ে ফেলে।”

বন্দীদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, “তাশরিফা” বা জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের পাঁজরের হাড় ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ফাখরানি

---

[89] কারাগারে রাতদিন, জয়নব আল-গাজালী : ৬১ পৃষ্ঠা।

আরও বলেন, তার এক সহবন্দি সাঈদ, যিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের একজন সদস্য ও ৪৭ বছর বয়সী, তাকে কায়রোতে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে যখন কারাগারে আনা হয়, তখন তার দুই হাত ভাঙা, গোড়ালি ছিন্ন, এবং সে দশ ঘণ্টা ধরে পুলিশ স্টেশনে বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।

ফাখরানির ভাষায়, "সাঈদকে তার কব্জি থেকে উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। তার মাথায় বারবার আঘাত করা হয়েছিল এবং এমনকি তার যৌনাঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়েছিল, যতক্ষণ না সে অজ্ঞান হয়ে যায়।"[90]

৩) হুসনী মুবারকের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী যে নির্যাতনের কৌশল ব্যবহার করত, বর্তমানে সেই একই পদ্ধতি পুনরায় প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করা, ধর্ষণ, হাতকড়া পরিয়ে আটক ব্যক্তিকে খোলা দরজায় ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদি। আরও একটি পদ্ধতির নাম "গ্রিল"। এই পদ্ধতিতে বন্দির হাত-পা একটি লোহার রডে বেঁধে রডটিকে দুই বিপরীত মুখী চেয়ারের মাঝে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর বন্দির পা অবশ হয়ে গেলে তার পায়ে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া শুরু হয়।

২০১৪ সালে গ্রেফতার হওয়া ২৩ বছর বয়সী এক ছাত্র জানায়, তাকে ৪৭ দিন আটক রাখা হয়েছিল এবং এই সময়ের মধ্যে তাকে বর্বর নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হতে হয়। সে বলে, "ওরা আমার শার্ট কেটে ফেলল, সেটি দিয়েই চোখ বেঁধে দিল, তারপর পেছন থেকে হাতকড়া পরাল... এরপর লাঠি দিয়ে পুরো শরীরে মারল—বিশেষ করে বুক, পিঠ আর মুখে... তারপর আমার বাঁ ও ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে দুটো তার লাগিয়ে চার-পাঁচবার বৈদ্যুতিক শক দিল।"

এই ছাত্র আরও ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, যেখানে তাকে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হতে হয়। সে বলে, "জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এক কর্মকর্তা

---

[90] https://tinyurl.com/ytvdhh6r

আমার অণ্ডকোষ চেপে ধরল... আমি ব্যথায় চিৎকার করছিলাম, পা ভাঁজ করে অণ্ডকোষ রক্ষা করার চেষ্টা করলাম, তখন সে আমার পায়ুপথে আঙুল ঢুকিয়ে দিল... তার হাতে প্লাস্টিক জাতীয় কিছু ছিল... সে এই কাজটি পাঁচবার করেছে।"[91]

সিরিয়া

১) অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নতুন এক প্রতিবেদনে সিরিয়ার সরকারের পরিচালিত এক ভয়ংকর সত্য প্রকাশ পেয়েছে। ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত, সাইদনায়া কারাগারে গোপনে ধারাবাহিকভাবে হাজার হাজার বন্দিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এই সময়কালে কমপক্ষে ১৩,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়, যাদের বেশিরভাগই ছিল সরকারবিরোধী সাধারণ নাগরিক।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি সপ্তাহে এক বা দুইবার, রাতের অন্ধকারে প্রায় ৫০ জন বন্দিকে তাদের সেল থেকে বের করে ফাঁসি দেওয়া হতো। সাধারণত সোমবার ও বুধবার রাতে এই কার্যক্রম চালানো হতো। বন্দিদের বলা হতো, তাদের অন্য একটি কারাগারে নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে, তাদের প্রথমে বেজমেন্টে নিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করা হতো, তারপর আরেকটি ভবনে নিয়ে গিয়ে চোখ বেঁধে ফাঁসিতে ঝোলানো হতো। তারা জানত না কখন মৃত্যু আসবে—সবকিছুই ছিল অনিশ্চিত, যতক্ষণ না ফাঁসির দড়ি তাদের গলায় পড়ে।

একজন প্রাক্তন বিচারক, যিনি এসব ফাঁসির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, জানান: "বন্দিদের ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হতো। অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত না, বিশেষ করে তরুণদের, কারণ তাদের ওজন কম ছিল। তখন কারাগারের সহকারীরা তাদের পা ধরে নিচের দিকে টানত, যাতে ঘাড় ভেঙে মৃত্যু নিশ্চিত হয়।[92]

---

[91] https://tinyurl.com/mwa8bnuy

[92] https://tinyurl.com/3a4wthfx

২) ওমর আল-শুগরি জানান, তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে গ্রেফতার হন এবং সিরিয়ার বিভিন্ন কারাগারে দুই বছরেরও বেশি সময় কাটানোর পর তাকে সাইদনায়া কারাগারে পাঠানো হয়, যেখানে তিনি ১০ মাস বন্দি ছিলেন।

তিনি বলেন: "আমি একবার ছিলাম 'ব্রাঞ্চ ২১৫' নামের একটি কারাগারে—এটা ছিল এমন এক দুঃস্বপ্ন, যা কল্পনাকেও হার মানায়। সেখানে পচে যাওয়া দেহে পোকা পড়ত। অনেকে এতটাই ক্ষুধার্ত থাকত যে একজন আরেকজনকে মেরে খেয়ে ফেলত। রোগবালাই এত ভয়ানক ছিল যে বিশ্বাস করা কঠিন। বন্দিরা সারাক্ষণ ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় কাতরাত।

তবুও এখন যখন পিছনে ফিরে তাকাই, তখন মনে হয়—ব্রাঞ্চ ২১৫-ই যেন ছিল জান্নাত। কারণ, সাইদনায়ার তুলনায় ওখানেই আমরা একটু স্বস্তিতে ছিলাম। ব্রাঞ্চ ২১৫-তে অন্তত কিছু দেখতে পেতাম, কিছু শুনতে পেতাম, বুঝতে পারতাম কী ঘটছে। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা আন্দাজ থাকত।

কিন্তু সাইদনায়ায় সবকিছুই ছিল অন্ধকার। সেখানে আমরা শুধু চুপচাপ বসে থাকতাম—শুধু অপেক্ষা করতাম, কখন শাস্তি আসবে। প্রতিটা মুহূর্তই ছিল যেন জীবনের শেষ পাঁচ সেকেন্ড। আপনি কিছুই করতে পারতেন না। একটা ছোট ঘরে আটকে রাখা হতো, আর আপনি জানতেন না—আজই কি আপনার মৃত্যু হবে? কারণ কারারক্ষীরা সবসময় বলত, 'তোমাদের যেকোনো সময় ফাঁসি দেওয়া হতে পারে।'"[93]

৩) অনেক বন্দী জানিয়েছেন, তাদেরকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে। কেউ কেউ জানান, তাদের অন্য বন্দিদের ধর্ষণ করতেও বাধ্য করা হতো। পিটুনি ও নির্যাতন ছিল এখানে প্রতিদিনের নিয়ম, যা মূলত অপমান ও ভয়ভীতি ছড়ানোর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এসব নির্যাতনের ফলে অনেকেই স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যান, কেউ

---

[93] https://tinyurl.com/5hy9tbcj

কেউ মারা যান। বন্দিদের শরীরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ও পুঁজ গড়িয়ে পড়ে কারাগারের মেঝে রক্তে ভেসে যেত। প্রতিদিন সকাল ৯টার দিকে কারারক্ষীরা মৃতদেহগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যেত।

নাদের নামী একজন সাবেক বন্দি বলেন: "প্রতিদিনই আমাদের সেলে দু'তিনজন করে মারা যেত... প্রতিদিন সকালে একজন গার্ড এসে প্রতিটি কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করত—'রুম নম্বর এক—কয়জন মরেছে? রুম নম্বর দুই—কয়জন?' এভাবে প্রতিটি রুমের হিসাব নিত। একবার এমন হয়েছিল, তারা প্রত্যেক কক্ষে ঢুকে আমাদের সবাইকে মাথা, বুক আর গলায় বেধড়ক মারধর করেছিল। সেদিন আমাদের উইং থেকে ১৩ জন মারা গিয়েছিল।"

খাবার ও পানি অনেক সময়ই বন্ধ করে দেওয়া হতো। আবার যখন দেওয়া হতো, তখন তা অনেক সময় কারারক্ষীরা সেলের মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিত। সেই খাবার পড়ে থাকত রক্ত ও ময়লার মধ্যে। খুব কম বন্দিই এই কারাগার থেকে জীবিত বের হতে পেরেছে। আর যারা বের হতে পেরেছে, তারা সাধারণত আগের তুলনায় অর্ধেক ওজনের কঙ্কালসার মানুষ হয়ে বের হয়েছে।[94]

আমেরিকা

১) তারপর আমি ফিরে এলাম কিউবিক ক্যাম্পে—এটাই ছিল আমার দেখা সবচেয়ে ভয়ংকর কারাগার। সেখানে আমাদের গায়ে শুধু একটি অন্তর্বাস পরিয়ে রাখা হতো। এমন অবস্থায়ই সারাদিন বসে থাকতে হতো, এমনকি ঘুমোতেও হতো বসে বসে, অর্ধনগ্ন অবস্থায়। শীত বা গ্রীষ্ম—মৌসুম যেমনই হোক, আমাদের পোশাক বা অবস্থা কখনো বদলাত না। শীতের দিনে গা গরম রাখার একমাত্র উপায় ছিল নিজের জায়গায় বসে বসে লাফানো।

---

[94] https://tinyurl.com/3a4wthfx

আমাদের পরিধানের মতো কাপড় ছিল না, ফলে নামাজ বা পর্দার সুযোগ মিলত না। খাবার ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তার ওপর সারাক্ষণ অপমান, হুমকি আর মারধর চলতেই থাকত। টয়লেটের চারপাশে কোনো আড়াল ছিল না, ফলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত সারা ক্যাম্পে। যে অল্প খাবার দেওয়া হতো, তাও দুর্গন্ধে খেতে ইচ্ছে করত না—বমি চলে আসত। নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে আমাদের পানি বা টিস্যু কিছুই দেওয়া হতো না। বাধ্য হয়ে আমরা একই হাতে নিজেকে পরিষ্কার করতাম, আবার সেই হাতেই খাবার খেতে হতো।

মানসিক রোগীদের জন্য আলাদা ব্লক ছিল, যেখানে আত্মহত্যাপ্রবণ বন্দিদের চিকিৎসায় ডাক্তার নিযুক্ত ছিল। প্রতিদিন কয়েকজন আত্মহত্যার চেষ্টা করতেন, যাদের ঘুম পাড়ানোর ইনজেকশন দেওয়া হতো—অনেকে তাতে আসক্তও হয়ে পড়েন। এই অমানবিক পরিবেশে সবাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ত। সন্দেহ-অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ত বন্দিদের মধ্যে—একজন আরেকজনকে গোয়েন্দাদের সহযোগী বলে সন্দেহ করত, আর যাদের সন্দেহ করা হতো, সবাই তাদের এড়িয়ে চলত। যখন সৈন্যরা কারও ওপর নির্যাতন চালাত, তখন সন্দেহভাজনদেরই দোষ দেওয়া হতো—বলা হতো, তারাই তথ্য ফাঁস করেছে। এতে তারা আরও ভেঙে পড়ত, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যেত। শেষমেশ তাদের ঠাঁই হতো সাইকিয়াট্রিক ক্যাম্পে।[95]

২) মাজিদ খান জানান, তদন্তকারীরা তার গোপনাঙ্গে বরফজল ঢেলেছে, তাকে দু’বার সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ভিডিও করেছে এবং বারবার তার গোপন অঙ্গে হাত দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, কিছু কর্মকর্তার শরীরে মদের গন্ধ ছিল। তিনি তার আইনজীবীদের জানান, তাকে জোর করে পায়ুপথ দিয়ে তরল খাবার এবং পানি

---

[95] অ্যাম্বাসেডর, আব্দুস সালাম জাইফ, ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা। ঈষৎ পরিমার্জিত।

দেওয়া হয়েছিল। পরে মার্কিন সিনেটের তদন্তে প্রমাণ মেলে যে, সত্যিই তার সঙ্গে এই অমানবিক আচরণ করা হয়েছিল।

২০০৩ সালের মে মাসে তার ওপর সবচেয়ে ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়। তখন তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে একটি কাঠের বিমে ঝুলিয়ে রাখা হয় টানা তিন দিন। এই সময় তাকে কিছু পানি দেওয়া হলেও কোনো খাবার দেওয়া হয়নি। প্রথম দিনের বিকেলে একবার তাকে নিচে নামিয়ে শিকল পরানো হয়, মাথায় কালো কাপড় (হুড) পরিয়ে বরফজলে ডুবানো হয়।

একবার এক চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করতে এলে, খান তার কাছে সাহায্য চান। কিন্তু চিকিৎসক সাহায্য করার বদলে পাহারাদারদের নির্দেশ দেন, তাকে আবার ধাতব বিমে ঝুলিয়ে রাখতে। এরপর টানা ২৪ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রেখে, তাকে নগ্ন অবস্থায় ক্যামেরার সামনে একটি 'স্বীকারোক্তি' লিখতে বাধ্য করা হয়।

তিনি আরও বলেন, তাকে এমন নোংরা ও দূষিত খাবার ও পানি দেওয়া হতো যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে তার ডায়রিয়া হয়। কখনো তাকে খোলা আকাশের নিচে, আবার কখনো এমন সেলে রাখা হতো যেখানে কামড়ানো পোকামাকড় ভরে থাকত। অন্য বন্দিরা জানান, তাদের অনেককেই কফিনের মতো ছোট ছোট বাক্সে আটকে রাখা হয়েছিল।[96]

৩) আফগানিস্তান থেকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েও তার উপরে নির্যাতন অব্যাহত থাকে। নিউইয়র্ক ডিটেনশন সেন্টারে ছয়জন পুরুষ সৈন্য তাকে জোরপূর্বক উলঙ্গ করে ধূলোবালি ভর্তি কক্ষ থেকে বাহিরে এনে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার ভিডিও ফিল্ম বানানো হয় এবং তাকে বলা হয়, এই ভিডিও ফিল্ম ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে তাকে মানসিক নির্যাতন করে পাগল বানানোর চেষ্টা করা হয়।

---

[96] https://tinyurl.com/t5j244pd

মার্কিন সরকার ‘সেন্ট্রাল কোর্টে’ আবেদন করে কিছু ছবির প্রচারণা নিষিদ্ধ করেছিল যার মধ্যে আফিয়ার উপরে চালানো নির্যাতনের সেই ছবিগুলোও ছিল। জাতিসংঘ ও জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম অনুযায়ী, বেআইনিভাবে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির উপর কোনোপ্রকার অপরাধের স্বীকারোক্তি চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ ছাড়াও নারীদের সতীত্ব রক্ষা সর্বাবস্থায় জরুরী। চাই তার উপর যে-কোনো অপরাধের অভিযোগ থাকুক। কিন্তু তার বিপরীতে ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে STRIP SEARCHING এর নামে পুরুষ সৈন্যদের উপস্থিতিতে উলঙ্গ করা হয়েছে এবং পুরুষ ডাক্তার তাকে তল্লাশি করেছে। সিনেটর মুশাহিদ হুসাইন মিডিয়ায় বলেন, আফিয়ার উপর নির্যাতনে ভয়াবহ এবং বর্ণনাতীত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ড. আফিয়া তাকে জানিয়েছেন, তার উপর মার্কিনীরা ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছে।[97]

চীন

১) একদিন ক্লাসরুমে যাবার পথে এক মহিলা গার্ডের সাথে দেখা হয়ে গেল। এক বন্দীর মরদেহ নিয়ে যাচ্ছিলো সে। এই নারী পুলিশ সদস্যও ছিল উইঘুর। বন্দীদের বাইরে পুরো ক্যাম্পে উইঘুর বলতে আমরা কেবল দুজনই ছিলাম। বাকিরা সবাই হান। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম ভাগ্যক্রমে ওখানে কোন সিসিটিভি ছিল না। নার্স আমাকে ফিসফিসিয়ে বললো, “আমরা বন্দীদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পিল খেতে দেই। এমনকি রুটির মধ্যেও ওষুধ মিশিয়ে দেই। কিন্তু তারপরও এই বন্দীর মাসিক হচ্ছিল। প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল। এক পর্যায়ে মারা যায় সে। দয়া করে কাউকে কখনো এসব বলবেন না। সমস্যা হবে!”

দশ হাজার উইঘুর কাযাখ মেয়েদের জন্য নির্ধারিত এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সব অফিসার ছিল হান পুরুষ। ক্লাস চলাকালীন সময়ে হুটহাট মেয়েদের ডেকে নিয়ে যেতো চীনারা। একদিন ক্লাস চলার সময় বিশ বছরের একটা মেয়েকে ডেকে নিয়ে

[97] আফিয়া সিদ্দিকি গ্রে লেডি অব বাগরাম, ১৪ পৃষ্ঠা।

গেল। 'ইন্টারভিউ' এর জন্য। দু' ঘণ্টা পর মেয়েটা যখন ফিরলো তখন ঠিকমতো বসতেও পারছিলো না সে। মেয়েটার অস্ফুট কান্না শুনে পুলিশ অফিসার খেঁকিয়ে উঠলো। আবার নিয়ে গেল মেয়েটাকে। তারপর ওকে আর কখনো দেখিনি...

ক্যাম্পে কাজ করা এক মহিলা পুলিশ সদস্যের কাছ থেকে একদিন শুনলাম, প্রতিদিন চার-পাঁচটা করে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে অফিসাররা গণধর্ষণ করে। অনেক সময় ওদের যোনি আর মলদ্বারে ইলেকট্রিক ব্যাটন ঢুকিয়ে শক দেয় চীনারা।[98]

২) আমার ছাত্রদের কথা আমার আজও মনে পড়ে। একজনের নাম ছিল উসমান। ভীষণ স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম। চীন সরকার তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আগে উসমান ছিল উরুমচির সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ীদের একজন। প্রতি ক্লাস শেষ হবার পর উসমান কাতর স্বরে অনুরোধ করতো, 'ম্যাডাম, দয়া করে আমাকে আর একটু সময় ক্লাসে কাটাতে দিন। জানালার ঐ ছোট্ট ফুটো দিয়ে আসা সূর্যের আলোটা একটু গায়ে মাখতে দিন। অনেকদিন হল, সূর্য দেখি না..."

হঠাৎ ক্লাসে আসা বন্ধ করে দিল উসমান। শুনলাম রক্তক্ষরণ হয়ে মারা গেছে। হাই ব্লাড প্রেশার ছিল ওর।

আরেকটা ছেলে ছিল। সেলিম। খুব পছন্দ করতাম ওকে। চটপটে খুব। বেচারা ভেবেছিল তাড়াতাড়ি চাইনিয শিখতে পারলে হয়তো তাড়াতাড়ি ক্যাম্পের নরক থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সেলিম মুক্তি পেল। তবে অন্যভাবে। অসুস্থ হয়ে পড়লো সে একদিন। ইনফেকশন। ক্যাম্পের ভয়ংকর পরিবেশে চিকিৎসা ছাড়া মামুলি ইনফেকশন খুব অল্প সময়ে খুব খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে গেলো। শেষমেশ একরকম বাধ্য হয়ে ওকে হাসপাতালে নিলো বিরক্ত চীনা গার্ডরা। কিন্তু রাস্তাতেই মরে মুক্তি পেল সেলিম।[99]

---

[98] কাশগড় কত না অশ্রুজল, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

[99] প্রাগুক্ত, ১৫২ পৃষ্ঠা।

৩) দোভাষীর মাধ্যমে হিমশীতল কণ্ঠে রুকাইয়া বললেন, 'বন্দীদের মধ্যে যাদের বয়স ৩৫ এর নিচে, তাদের সবাইকে ধর্ষণ আর যৌন নির্যাতন করত ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ। নারী, পুরুষ বাছবিচার করে না ওরা। সবাইকেই যৌন নির্যাতন করে!'

জি পাঠক, আপনি ঠিকই পড়েছেন। ৩৫ বছরের কম যেকোনো বন্দী-হোক সে পুরুষ বা নারী-চীনা পুলিশ তাদের ধর্ষণ করে, যৌন নিপীড়ন করে! এই মুশরিক চীনাদের পক্ষে আর কতটা নীচে নামা সম্ভব?[100]

৪) নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতায় পিছিয়ে ছিল না চীনা মহিলা গার্ডরাও। ৪০ বছরের গুলজিরা আউলখান দেড় বছর ক্যাম্পে বন্দী ছিলেন। তিনি জানাচ্ছেন, 'নারী গার্ডরা চুইংগাম চিবুতে চিবুতে আমাদের কাছে আসত। আমাদের যোনিতে চুইংগাম সেঁটে দিত। তারপর একটা একটা করে সেখানকার পশম উপড়াত। পুরো সময়টাতে নোংরা রসিকতা করত ওরা একে ওপরের সাথে।'

মহিলা গার্ডরা গোলমরিচের গুঁড়োর সাথে পানি মিশিয়ে শরবতের মতো বানাত। গোসল করার জন্য তো বন্দীদের আগেই নগ্ন করেছে, এবারে এই তরল বন্দিনীদের হাতে দিয়ে বলত তোমাদের যোনিতে এটা ছিটাও। যারা গার্ডদের কথা শুনত না তাদের ভাগ্যে জুটত কঠোর অত্যাচার। যারা শুনত তারা ভাবত গার্ডদের কথা না শুনলেই বোধহয় ভালো হতো। গোলমরিচের গুঁড়ো মিশ্রিত পানি ঢালার পর মনে হতো যেন আগুন লেগে গেছে ওখানে। পুড়তে পুড়তে, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিতে দিতে গড়িয়ে নামত পানি। গোলমরিচের গুঁড়ো মেশানো পানি।[101]

ইয়েমেন

---

[100] প্রাগুক্ত, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

[101] কাশগড় কত না অশ্রুজল, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

১) হুথিরা নির্যাতনের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে, যার মধ্যে শারীরিক এবং মানসিক উভয় ধরণের নির্যাতন অন্তর্ভুক্ত। হুথিদের সবচেয়ে প্রচলিত নির্যাতনের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ভারী বস্তু যেমন রাইফেলের বাট দিয়ে নির্মম প্রহারের মতো শারীরিক নির্যাতন। এছাড়াও তারা বন্দীদের হাত বেঁধে দীর্ঘ সময় ঝুলিয়ে রাখা, নগ্ন অবস্থায় চাবুক মারা এবং এমনকি এসিড বা অন্যান্য দাহ্য রাসায়নিক পদার্থও ব্যবহার করত। এসব নির্যাতনের ফলে অনেক বন্দী স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যান এবং কেউ কেউ নির্যাতনের সময় মৃত্যুবরণ করেন, বিশেষত যাঁদের মাথায় লাঠি দিয়ে মারা হয়েছিল কিংবা যাঁদের ওপর এসিড ছিটানো হয়েছিল।

৪০ বছর বয়সী ইব্রাহিম গানদারি, যিনি প্রায় পাঁচ বছর হুথিদের হাতে বন্দী ছিলেন, ইউরো-মেড মনিটরকে বলেন: "আমার অপরাধ ছিল রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা। আমাকে কোনো আদালতে নেওয়া হয়নি, আইনজীবীও দেওয়া হয়নি। তারা আমাকে তারের কেবল দিয়ে মারত, হাত-পা পেছন থেকে চেইনে বেঁধে রাখত। ব্যথা কমানোর কোনো ওষুধ দিত না।

আমি ছিলাম একটি গুমোট ঘরে—যেখানে বাতাস, আলো বা সূর্য কিছুই ঢুকত না। সেখানে অতিরিক্ত বন্দী ছিল, গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতেও জায়গা মিলত না। দিনে মাত্র তিনবার, সেটাও দুই মিনিটের জন্য টয়লেট ব্যবহার করতে দেওয়া হতো। পরিবারকে ফোন করতে পেরেছিলাম আট মাস পর।"[102]

২) খলিল বলেন: "আমি নিজ চোখে দেখি, তারা আমার ভাই মুজাহিদকে টেনে হিঁচড়ে জিজ্ঞাসাবাদের কক্ষে নিয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা পর তার গগনবিদারী চিৎকার শুনি—'বাঁচাও... বাঁচাও!' সে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চিৎকার করছিল। এক জিজ্ঞাসাবাদক তাকে বলতে থাকে, 'স্বীকারোক্তি দাও।' তারপর ধীরে ধীরে তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। সেই রাত ছিল মহানবী (সা.)-এর জন্মদিন। আমাদের চুল

---

[102] https://tinyurl.com/2nznny7c

কাটার সময়, নাপিত যখন মুজাহিদের কক্ষে ঢোকে, তখন দেখে সে নিথর পড়ে আছে—মৃত।”

সুলতান বলেন, তার ভাই আব্দুল্লাহ (২০), যে ইসলাহ পার্টির সদস্য ছিল: “আমরা তার অবস্থান জানতে পারার দুই সপ্তাহ পরে তাকে দেখতে পারি। আমি স্পষ্টভাবে তার ক্লান্তি ও অবসন্নতা দেখতে পেয়েছিলাম। সে আমাদের জানায়, তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। তাকে আট দিন ধরে তার ছোট্ট সেলের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল, কারণ তাকে অনেকবার প্রহার করা হয়েছিল। যখন সে আমাদের পিঠের ক্ষত দেখাতে চেয়েছিল, তখন পাহারাদাররা বাধা দেয়।”

তিনি আরও বলেন: “সে টাইফয়েড জ্বরে ভুগছে এবং তার পাকস্থলীতে ছত্রাক হয়েছে, কারণ তাকে চিকিৎসার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। আবদুলইলাহ আর আগের মতো নেই, সে যেন কঙ্কাল হয়ে গেছে।”[103]

৩) হাইথাম আল-শিহাব, ৩০ বছর বয়সী এক সাংবাদিক, হুথি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত কারাগারে প্রায় ২,০০০ দিন বন্দী ছিলেন। তিনি জানান, তাকে নিয়মিত লাঠি দিয়ে পেটানো হতো, ঠান্ডা পানি ঢালা হতো, এবং দেওয়া হতো বৈদ্যুতিক শক।

তিনি বলেন: “আমার দুই হাত পেছনে বাঁধা ছিল, যা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো। ব্যথা এত তীব্র ছিল যেন মনে হতো হাতদুটো শরীর থেকে ছিঁড়ে যাচ্ছে।”

তিনি আরও জানান: “কিছু বন্দীকে এত বেশি নির্যাতন করা হতো যে তাদের একসময় একটি পা কেটে ফেলতে হতো। চিকিৎসকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল অস্ত্রোপচার করাতেন, যেন আবারও অপারেশনের অজুহাতে নির্যাতন চালানো যায়।”

---

[103] https://tinyurl.com/4b4wy4pe

সোনিয়া আল-ঘোবাস, ৩১ বছর বয়সী এক তালাকপ্রাপ্ত নারী, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হুথি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেতন না দেওয়ার প্রতিবাদ করার দায়ে গ্রেপ্তার হন।

তিনি বলেন: "২০১৯ সালের মার্চে গ্রেপ্তারের পর, আমার ওপর চালানো হয় চরম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন—বৈদ্যুতিক শক, চড়-লাথি, চামড়া তুলে ফেলা, পিঠে ও পেটে পেরেক ঢোকানো, এমনকি জোর করে পায়ের নখও তুলে ফেলা হয়।"[104]

সৌদী আরব

১) সৌদি আরবের উলামায়ে কেরাম পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত আলেমদের অন্যতম। সৌদ পরিবারের স্বেচ্ছাচারিতা ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যারা যারা মুখ খুলেছেন, তারা সবাই এখন সৌদিতে জেলে বন্দী আছেন। তাদের মধ্য অনেকে বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা উলামায়ে কেরামের অন্তভুর্ক্ত। বিভিন্ন সময় তারা বিভিন্ন মেয়াদে কারারুদ্ধ ছিলেন এবং আছেন। তাদের কেউ কেউ তো দুই যুগের বেশি সময় থেকে বন্দী হয়ে আছেন।

তাদের মধ্য উল্লেখযোগ্য হল কয়েকজন হলে মুহাদ্দিস সুলাইমান বিন নাসির আল-উলওয়ান, শাইখ ওয়ালিদ আস-সিনানী, শাইখ আলী আল-খুদাইর, শাইখ আব্দুল আজিজ আত-তারিফী, শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, শাইখ খালিদ আর-রাশিদ, শাইখ নাসির আল-ফাহদ, শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান, শাইখ সাফার আল-হাওয়ালী প্রমুখ।

কেউ কেউ তো অমানবিক অত্যাচারের দরুন জেলের মধ্যই ইন্তিকাল করেন। যেমন শাইখ ফারিস আয-যাহরানী (আবু জানদাল আল-আযদী), শাইখ ফাহদ আল-কাযী প্রমুখ।

---

[104] https://tinyurl.com/3rm82svf

"শাইখ আলী আল-খুদাইরের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে, দীর্ঘ বন্দী অবস্থায় তিনি ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন—এবং এই নির্যাতন এখনো থামেনি।

তাদের মতে, তাঁর ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে পৈশাচিক পদ্ধতিগুলো ছিল: লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, আগুন ও হিট প্রয়োগ করে নির্যাতন, পানির মাধ্যমে শ্বাসরোধের চেষ্টা, মুখমণ্ডল ও দাড়ির লোম উপড়ে ফেলা, আঙুলের নখ তুলে নেওয়া—এবং আরও অনেক কৌশল, যেগুলো অমানবিকতার সীমা ছাড়িয়েছে।

শাইখ খালিদ আর-রাশিদের ঘনিষ্ঠজনেরা বলেন, বন্দী হওয়ার শুরু থেকে আজ অবধি নিরবচ্ছিন্ন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছেন—যা তাঁর শরীর ও মনস্তত্ত্বের ওপর গভীর ক্ষতচিহ্ন রেখে চলেছে।"[105]

২) প্রসিদ্ধ স্কলার সাফার আল-হাওয়ালী সম্পর্কে একটি রিপোর্টে উপস্থাপিত তথ্যের কিছু অংশ তুলে ধরছি এখানে— "কমিটির সদস্য মার্কুস শেফার বলেন, "গত ছয় বছর ধরে আল-হাওয়ালি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়ে আসছেন—যার মধ্যে রয়েছে: জোরপূর্বক গুম, অন্যায্যভাবে আটক, ন্যায়বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, চিকিৎসা সেবার অধিকার হরণ, এমনকি শারীরিক নির্যাতন ও অমানবিক আচরণও।"

৭৬ বছর বয়সী আল-হাওয়ালি একাধিক স্ট্রোকের কারণে স্থায়ী অক্ষমতায় ভুগছেন। এই শারীরিক সীমাবদ্ধতা তার কথা বলার ক্ষমতা, চলাফেরা এবং আত্ম-পরিচর্যার সামর্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি দীর্ঘস্থায়ী *Apraxia of*

---

[105] https://tinyurl.com/bwbk787t

Speech (কথা বলার অক্ষমতা)-এ আক্রান্ত, যার ফলে মুখের পেশি ব্যবহার করে স্পষ্টভাবে কথা বলা সম্ভব হয় না।

তিনি নিজে নিজে চলাফেরা করতে অক্ষম। ভাঙা পেলভিস এবং কিডনি অকার্যকারিতার মতো গুরুতর শারীরিক সমস্যা তার অবস্থাকে আরও সংকটময় করে তুলেছে—যার জন্য নিয়মিত ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সহায়তা একান্ত প্রয়োজন।"[106]

৩) প্রত্যেক বন্দীকে নিজেকে "তদন্তকারী" দাবিদার এবং তার সহযোগী নির্যাতনকারীদের হাতে প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। চাবুক, পেরেক লাগানো লোহার বা কাঠের লাঠি দিয়ে শরীরের প্রতিটি অংশে আঘাত করা হয়—মাথা, পিঠ, হাত-পা, এমনকি শরীরের গোপন ও সংবেদনশীল অঙ্গেও। মুখে চড়, বুট দিয়ে লাথি, আর অবিরাম অপমান—সবই চলে একসাথে। মুক্তিপ্রাপ্ত অনেক বন্দীর শরীরে মাসের পর মাস ধরে ছিল সেই নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন। যা প্রমাণ করে—এই নির্যাতন একদিন বা দুই দিনের নয়, বরং দিনের পর দিন চলা এক নিপীড়নের ধারাবাহিকতা।

এই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো বিদ্যুৎ-শক। বন্দীর শরীরে বিদ্যুতের তার লাগিয়ে উচ্চমাত্রার স্রোত চালানো হয়। তীব্র যন্ত্রণা, পেশির টান ও শরীরের ভেতর দগ্ধ হওয়ার অনুভূতি তাকে অচেতন করে তোলে। অজ্ঞান হলে কিছুক্ষণ পরে তাকে জোর করে আবার সচেতন করে সেই একই প্রক্রিয়া চালানো হয়, যতক্ষণ না তার শরীর ও মন একেবারে ভেঙে পড়ে। নির্যাতন আরও ভয়াবহ করে তোলা হয় যখন তার শরীরে পানি ঢেলে বিদ্যুৎ-শকের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়—ফলে ব্যথা হয় অসহনীয়।

অপর এক পাশবিক নির্যাতনের রূপ হলো—নগ্ন করার মাধ্যমে অপমান। বন্দীকে হুমকি, গালি ও চিৎকারের মধ্য দিয়ে তার পোশাক খুলে ফেলতে বাধ্য করা হয়।

---

[106] https://tinyurl.com/5234bamp

কখনো একাধিক বন্দীকে একে অপরের সামনে নগ্ন করা হয়, যার ফলে মানসিকভাবে তারা ধ্বংস হয়ে পড়েন। অথচ এই নির্যাতনকারীরা নিজেদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "সম্মানিত" হিসেবে তুলে ধরেন।

পানিতে ডুবিয়ে রেখে নির্যাতন করাও কম বর্বর নয়। বন্দীর মাথা ঠান্ডা, নোংরা পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়, যতক্ষণ না সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে আসে। একটু নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ দিয়ে আবার জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এই চক্র চলতে থাকে বারবার, যতক্ষণ না বন্দী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।

এছাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখা হয় কোনো খাবার বা পানির সুযোগ না দিয়ে। কখনো হাত দিয়ে, কখনো পা ধরে উল্টো করে। অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ঝুলিয়ে তার গায়ে বরফ ঠান্ডা পানি ঢেলে দেওয়া হয়, কিংবা আবর্জনা ছুঁড়ে মারা হয়। টয়লেট ব্যবহার বা পানি পান করার সুযোগ না দেওয়ায় বন্দীর শারীরিক কষ্ট চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়।

এসব অভিজ্ঞতা বন্দীদের মনে এমন বিভীষিকাময় স্মৃতি গেঁথে দেয়, যা অনেক বছর পরেও ভুলে যাওয়া যায় না— এমনকি মুক্তি পাওয়ার পরেও নয়। আর অনেকেই তো মুক্তিও পান না, বছরের পর বছর অন্যায়ভাবে শাস্তির নামে বন্দী থাকেন, এক ভয়াল অন্ধকারে।[107]

আফগানিস্তান[108]

---

[107] https://tinyurl.com/2up9hwya

[108] এখানে নাইন ইলেভেন পরবর্তী আফগানিস্তানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যখন বিশ্ব মোড়ল সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আফগানিস্তানে নির্বিচারে হামলা চালিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে এবং ইতিহাসের নিকৃষ্ট নির্যাতন নিপীড়ন করে। তবে আল্লাহর অনুগ্রহে ২০২১ সালের ১৫-ই আগস্ট আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় পুনরায় আফগানিস্তানে তালেবান

১) সৈন্যরা কুকুর নিয়ে আসত এবং একে একে সবাইকে তল্লাশি করত। একজনকে তল্লাশি চলাকালে অন্যদের তাঁবুর শেষ প্রান্তে পাঠানো হতো। কয়েকদিন পর এ আতঙ্কে অনেকেই ইনসমনিয়ায় (ঘুমুতে না পারার অসুখ) আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমাদের দেওয়া হতো মিলিটারিদের জন্য প্যাকেটজাত খাবার—যেগুলো মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার, বহু আগেই মেয়াদোত্তীর্ণ। খাবারে থাকত সবজি ও মাংস, তবে হালাল কি না বুঝতাম না। অনেক ভাই ইংরেজি না জানায় ভুল করে শূকরের মাংস খেয়ে ফেলতেন। অধিকাংশ খাবারই ছিল পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত।

আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ হলো ভালো এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া। অথচ আমরা উপোস থাকতাম এবং কখনো কখনো আমাদেরকে জোর করে খাওয়ানো হতো। রমজান মাসে আমাদেরকে হালাল লেখা খাবার দেওয়া হয়েছিল। সাথে ছিল কোশের (ইহুদিদের জন্য বৈধ)। অনেক মুসলিমই মনে করতেন কোশের খাওয়া তাদের জন্যও বৈধ।। আফগানি রুটি ও ক্যান্ডি পেলে যেন ছোটখাটো উৎসব লেগে যেত। খাবার বড় বক্সে করে নিয়ে এসে ছিদ্র দিয়ে বিতরণ হতো—এক বোতল পানি ও এক প্যাকেট খাবার করে। তবে ৩০ মিনিটের মধ্যে না খেলে শাস্তি দেওয়া হতো। টয়লেটের জন্য একটি বালতি দেওয়া হয়েছিল, যেটা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকলেও, একজন গার্ড ও বিশজন বন্দীর সামনে কোনো গোপনীয়তা ছাড়াই ব্যবহার করতে হত।[109]

কারাগারে বন্দী ভ্রু, চুল, গোঁফ এমনকি দাড়িও চেঁছে ফেলা হত। নাপিতকে দাড়ি কাটতে নিষেধ করলে মারধর করা হত। এমনকি ডাক্তারকে অসুস্থতার কারণ হিসেবে নির্যাতনের কথা বললে স্বয়ং ডাক্তার মারধর শুরু করত।[110]

ক্ষমতা লাভ করে। আমেরিকা এবং তার স্থানীয় দালালরা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে আজ পর্যন্ত আফগানিস্তানে শান্তি বিরাজ করছে।

[109] অ্যাম্বাসেডর, আব্দুস সালাম জাইফ, ৫২ পৃষ্ঠা। সংক্ষেপিত।

[110] অ্যাম্বাসেডর, আব্দুস সালাম জাইফ, ৬৩ পৃষ্ঠা। ঈষৎ পরিমার্জিত।

২) ২০০২ সালে বাগরাম বিমানঘাঁটিতে আটক রাখা আফগানরা জানিয়েছেন, তাঁদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ আটক রাখা হয়েছিল—হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায়। তাঁদের ঘুমাতে দেওয়া হতো না, ইচ্ছাকৃতভাবে জেগে রাখা হতো দীর্ঘ সময় ধরে, এবং যন্ত্রনাদায়ক ভঙ্গিতে হাঁটু গেঁড়ে বা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হতো। কেউ কেউ বলেছেন, শীতের মধ্যে তাঁদের ওপর বরফ-ঠান্ডা পানি ঢালা হতো।

২০০২ সালের মার্চে বাগরামে আটক দুই বন্দী, তারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানান, তাঁদের কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি কক্ষে অন্য বন্দীদের সঙ্গে রাখা হয়েছিল, কেবল অন্তর্বাস ও স্যান্ডো গেঞ্জি পরে। তাঁদের ভাষ্যমতে, সেলে বিশাল লাইট স্থাপন করা হয়েছিল, যা সোজা তাঁদের চোখের ওপর ফেলা হতো, এবং মার্কিন সেনারা পালাক্রমে ডিউটি করে লোহার রড দিয়ে সেলের দেয়ালে আঘাত করে তাঁদের ঘুমাতে দিত না।

তাঁরা বলেন, টানা ঘুম না দিতে দেওয়ায় তাঁরা ভীত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁদের উজ্জ্বল স্পটলাইটের নিচে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হতো। বলা হতো, কোনো প্রশ্ন করার আগে এক ঘণ্টা নড়াচড়া না করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—কোনোভাবেই মাথা ঘোরানো যাবে না। কেউ নড়লে “ঘড়ি পুনরায় শুরু” করা হতো।

এক ব্যক্তি জানান, কান্দাহারে পৌঁছানোর পর তিনি ও অন্যান্য বন্দীরা কীভাবে মারধরের শিকার হন: “আমাদের চোখ বেঁধে হেলিকপ্টার থেকে নামানো হয়েছিল। একজন আমাকে হাতে ধরে টেনে তুলল এবং সিঁড়ি থেকে নিচে ফেলে দিল। তারপর আমাকে চিৎ করে শুইয়ে রাখল। আমরা নড়াচড়া করতে পারতাম না, করলে মার খেতে হতো। অন্যদেরও একইভাবে মারধর করা হতো।

কান্দাহারে আমাদের একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হতো না, কেউ বললে তাকে পেটানো হতো। ঘুমানোর অনুমতি ছিল না—যদি ঘুমিয়ে পড়তাম, জাগিয়ে তোলা হতো; কেউ যদি মাথা ঢেকে রাখত, তাহলে প্রচণ্ডভাবে মারা হতো। তারা

আমাদের লাথি মারত, ঘুষি দিত। সত্য বলতে, তারা আমাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করত।"[111]

বাংলাদেশ

১) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজশাহীর এক ব্যবসায়ী বন্দীকে দেখেছি, যার পুরুষাঙ্গে তিন কেজির পাথর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমন বন্দীও দেখেছি, যার পুরুষাঙ্গের সাথে বিদ্যুতের ক্লিপ লাগিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করে দেয়া হয়েছে। উলঙ্গ করে দশজন মানুষের সামনে দাড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আলেম ও দ্বীনদার মানুষকে। পায়খানার রাস্তা দিয়ে একের পর এক গরম ডিম বা ঠাণ্ডা বরফ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এমন বন্দীও দেখেছি, হাত-পায়ের সমস্ত নখগুলোকে প্লাস দিয়ে টেনে টেনে তুলে নিয়েছে। হাতের আঙ্গুলের ভিতর পিন ঢুকিয়ে দিয়েছে অতঃপর সেই পিনের মাথায় অনবরত আঘাত করেছে বা গ্যাস লাইটে আগুন ধরিয়ে পিনের মাথায় উত্তাপ দিয়েছে এতে আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকানো সম্পূর্ণ পিন গরম হয়ে আঙ্গুলের মাথা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। দুই হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে বা দু পা উপরে দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বন্দীর সামনে তার স্ত্রীকে, বোনকে বা মাকে এনে উলঙ্গ করে ফেলেছে। এমন বন্দীও আছে যার স্ত্রীকে এনে উপর্যুপরি ধর্ষণ করেছে। ষোল বার ধর্ষণ করা হয়েছে একজনের স্ত্রীকে- এমন ঘটনাও ঘটেছে।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী আঠারো-বিশ বছরের একটি ছেলেকে দেখেছি তাকে উপুড় করে ফেলে পিঠের উপর পাড়া দিয়ে দুই হাত পেছন দিকে মুড়ে উভয় হাতের হাড্ডি ভেঙ্গে ফেলেছে। দু'হাত ব্যান্ডেজ করা ছেলেটিকে দেখলে চোখের পানি সংবরণ করা কঠিন।কাউকে দেখেছি, মাসের পর মাস পেছনে হাত বেঁধে

---

[111] https://tinyurl.com/249sb63m

হ্যান্ডকাপ পরানো হয়েছিল। একজনকে টানা ৩৬ দিন হাত উঁচু করে দাড় করিয়ে রাখা হয়েছিল।[112]

২) ইনামুল হাসান ফারুকী—আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী (রহ.)-এর স্নেহধন্য ছাত্র ও ঘনিষ্ঠ খাদেম—বলেন, ২০২১ সালের ২১ মে তাকে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নেওয়া হলে তিনি চরম নির্যাতনের শিকার হন। প্রথম ছয়দিন তাকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হাত পিছনে নিয়ে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখা হয়। একইসাথে চলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অকথ্য গালিগালাজ।

নির্যাতনের এক পর্যায়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লে তাকে জানালার গ্রিলে হ্যান্ডকাফসহ ঝুলিয়ে রাখা হয়। টানা ছয়দিন দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তাঁর পেট ফুলে যায়, ফোসকা পড়ে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত ফুলে ওঠে এবং পায়ের চামড়া খসে পড়ার উপক্রম হয়। ক্ষতস্থান থেকে পচা পুঁজ ও পানি বের হতো, অথচ কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি—এমনকি তা মুছতেও দেওয়া হয়নি।

খাবার তো দূরে থাক, এক ঢোক পানিও তাঁকে দেওয়া হয়নি। ‘পানি পানি’ বলে কাঁদতে থাকলেও পুলিশ তাঁর প্রতি ছিল নির্মম ও নির্দয়। এমনকি যখন ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ত তাঁর, তখনও অমানুষগুলি তাঁর একহাতে হ্যান্ডকাফ দিয়ে রাখত এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে বাধ্য করত।

তিনি বলেন, রিমান্ডে কেশব চক্রবর্তী নামের এক কর্মকর্তা তাঁকে বারবার হুমকি দিয়েছে: “তোকে এমনভাবে টর্চার করব, যে তুই ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে যাবি; কোনো ট্রিটমেন্টে তোর কোনো কাজ হবে না।” তারা তাঁর শরীরের স্পর্শকাতর বিভিন্ন স্থানে প্লাস দিয়ে মোচড় দেওয়া হতো। ২৩ দিন ধরে রিমান্ডে চলতে থাকে

[112] কারাগার থেকে বলছি, মাওলানা মামুনুল হক, ১১৯-১২০ পৃষ্ঠা। ঈষৎ পরিমার্জিত।

অমানবিক নির্যাতন। দীর্ঘ সময় হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখার ফলে তাঁর হাতের মাংস কেটে ভেতরে ঢুকে যায়। ব্যথা ও যন্ত্রণায় বারবার অজ্ঞান হয়ে যেতেন তিনি।

আজ চার বছর পরও তিনি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারেন না। এখনো রাতে ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়—হাত কেমন ভারী লাগে, মনে হয় যেন হ্যান্ডকাফ লাগানো আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম এই মানুষটির শরীরে এখন বাসা বেঁধেছে জটিল রোগ, এমনকি ক্যান্সারও ধরা পড়েছে।[113]

৩) চাঁদপুরের বাসিন্দা মাসুদ গাজী – যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ তাবলীগের মেহনতের সঙ্গে যুক্ত – জানান, তাকে প্রায় ৪৫ দিন গুম করে রাখা হয়েছিল। এ সময় তাকে রাখা হয় মাত্র ৩ ফুট × ৬ ফুট আকারের একটি টয়লেটে, যার মধ্যে প্রায় দুই ফুটজুড়ে ছিল কমোড, আর বাকি চার ফুট ছিল ফ্লোর। সেই সীমিত জায়গার মধ্যেই তাকে নামাজ, খাওয়া, ঘুম, গোসল—সবকিছুই সম্পন্ন করতে হতো। সেখানে তাকে হাতের ওপর ইলেকট্রিক শক দেওয়া হতো, উল্টো করে ঝুলিয়ে পায়ের পাতায় প্রহার করা হতো, আঙুলের অগ্রভাগে প্লাস দিয়ে চাপ দেওয়া হতো – এ রকম নানা ধরনের নির্যাতন চালানো হত।

তিনি আরও বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় এএসপি আলেপ শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দুই কানে একসঙ্গে চড় মারত। মোটা, চিকন, শক্ত – বিভিন্ন ধরনের লাঠি দিয়ে হাড়সমূহে প্রহার করা হতো। কথায় কথায় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হতো, যা কোনো সভ্য মানুষ জীবনে শুনেওনি। সেখানে তারা তার দাড়ি ধরে টানাটানি করত এবং বলত, ‘তোর দাড়ি আমরা কেটে ফেলব’।

মাসুদ গাজী জানান, সেখানে অনেক বন্দিকে ২৪ ঘণ্টা চোখ বেঁধে ও হাতকড়া পরিয়ে রাখা হতো। কারও লজ্জাস্থানে পাথর বেঁধে রাখা হতো, কাউকে পিছন দিকে

---

[113] মাওলানা ইনামুল হাসান ফারুকী নিজে আমার নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করেন। অনলাইনে বিভিন্ন সাক্ষাতকারেও সেগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন।

হাত নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে সারারাত ঝুলিয়ে রাখা হতো। কারও খাবার খাওয়ার পর তাকে টর্চার রুমে নিয়ে যাওয়া হতো এবং পেটের ওপর শক্ত লাঠি রেখে, তার ওপরে দুজন উঠে দাঁড়িয়ে চাপ দিত। এত জোরে চাপ দেওয়া হতো যে, একপর্যায়ে নির্যাতিত ব্যক্তির মলদ্বার দিয়ে মল ও মূত্র বেরিয়ে আসত। আবার কারও দুই কানে ইলেকট্রিক ক্লিপ লাগিয়ে শক দেওয়া হতো। এ রকম আরও বহু অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা সেখানে ঘটানো হতো।[114]

[114] এক অডিও বার্তায় জনাব মাসুদ গাজী নিজে আমাকে এই ঘটনা জানান।

বন্দীদের বিষয়ে কতিপয় মাসআলা

প্রশ্ন: যাকাতের জন্য তো মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত, বন্দী মুক্তি খাতে যাকাতের মাল কিভাবে ব্যবহৃত হবে?

উত্তর: কুরআনে বর্ণিত যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে প্রথম চারটি খাতে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরাম একমত। কিন্তু শেষের চারটি খাতে জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত নয়। আর বন্দী মুক্তি খাত তথা 'ফির রিকাব' কুরআনে বর্ণিত পাঁচ নাম্বার খাত, তাই তাতে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত নয়।[115]

প্রশ্ন: বন্দী কর্তৃক প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়ে নিজেকে মুক্ত করা কি বৈধ?

উত্তর: নিজেকে জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়ে নিজেকে মুক্ত করা নাজায়েয নয়। কারণ, মৌলিকভাবে যদিও তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া কুফর, তবে তা নিঃশর্ত নয়।

যখন শরীয়াহ বিচার ব্যবস্থা না থাকে, তখন যদি কেউ অনন্যোপায় হয়ে তার ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য বা জুলুম থেকে বাঁচার জন্য তাগুতের শরণাপন্ন হয় এবং শরীয়াহ বিচারই যে উত্তম, তার উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহলে তা কুফর নয়। উলামায়ে কেরাম এটিকে জায়েয বলেছেন। এটি তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া

---

[115] ফিকহুত তাজিরিল মুসলিম লি হুসামুদ্দীন 'আফানাহ: ৭৪ পৃষ্ঠা। আল-মুগনী লি ইবনি কুদামাহ, ২/৫০০।

নয়, বরং নিজেকে এবং নিজের দ্বীনকে জুলম ও ফিতনা থেকে রক্ষা করার নামান্তর।[116]

প্রশ্ন: বন্দীর পরিবারের ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী?

উত্তর: বন্দী মুক্ত করা সম্ভব না হলেও অন্তত তার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব মুসলিমদের নেওয়া উচিত। এটা সর্বনিম্ন দায়িত্ব—যে সে মুক্ত থাকা কালে তার স্ত্রী-সন্তান ও যাদের সে দেখভাল করত, তারা যেন অভাব-অনটনে জীবনযাপন না করে।[117]

প্রশ্ন: বন্দীদের জন্য কী জেল থেকে পালানো জায়েজ?

উত্তর: বন্দীর (সক্ষমতা থাকলে) জেল থেকে পালানোর হুকুম হচ্ছে ওয়াজিব। কারণ, বন্দী এখন কাফিরের কর্তৃত্বাধীন, আর ইসলাম সর্বদা উন্নত থাকবে—তার ওপর কেউ কর্তৃত্ব করতে পারে না। তাই যদি কোনো মুসলমান শত্রুর হাত থেকে পালাতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য পালানো ওয়াজিব। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি সে পালানোর চেষ্টা না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে।[118]

বন্দী যদি কাফেরদের নিকট থেকে পালাতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য পালিয়ে যাওয়া আবশ্যক—এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।[119]

প্রশ্ন: বন্দীদের জন্য বা বন্দী মুক্তি খাতে ওয়াকফকৃত সম্পদ ব্যয় করা যাবে?

---

[116] https://tinyurl.com/2n5e3v5e

[117] আল-ওয়াজিয ফি আহকামিল আসিরিল মুসলিম লিশ শাইখ হারিস আন-নাযযারী রাহিমাহুল্লাহ, ১০৫ পৃষ্ঠা।

[118] আল-ওয়াজিয ফি আহকামিল আসিরিল মুসলিম, ২২ পৃষ্ঠা।

[119] মাশারি'উল আশওয়াক লি ইবনিন নুহাস, ১০৫৩ পৃষ্ঠা।

উত্তর: হ্যাঁ, সাধারণভাবে ওয়াকফকৃত (খাত নির্দিষ্ট অয় এমন) সম্পদ বন্দী মুক্তি খাতে ব্যয় করা যাবে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহি.) বলেন: "বন্দী মুক্তি করা হল সবচেয়ে বড় ওয়াজিবগুলির একটি, আর এ জন্যে ওয়াকফকৃত সম্পদ বা অন্যান্য ধন-সম্পদ ব্যয় করা অনেক বড় সওয়াব অর্জনের মাধ্যম।[120]

প্রশ্ন: বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির হুকুম কী?

উত্তর: বন্দী ব্যক্তি যদি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের কারণে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। তবে সেটা 'হুকমী শহীদ' তথা আখিরাতের হিসেবে শহীদ। কারণ তাকে কোনো কাফের বা মুরতাদ হত্যা করেছে।[121] এমনকি যদি সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণও করে কারাগারে থাকবস্থায়, তাহলেও ইনশাআল্লাহ সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ এক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ওপর হওয়া জুলুমের কারণে নিহত হল, সে শহীদ।"[122]

প্রশ্ন: বন্দী যদি ওজুর জন্য পানি এবং তায়াম্মুমের জন্য মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু না পায়, তাহলে কিভাবে সালাত আদায় করবে?

উত্তর: বন্দী যদি এভাবে পানি ও তায়াম্মুমের জন্য কিছু না পাওয়া অবস্থায় সালাতের সময় হয়ে যায়, তাহলে সে ওজু ও তায়ম্মুম ব্যতীতই সালাত আদায় করে নিবে। এমতাবস্থায় তাকে পরবর্তীতে আর এই সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে যদি কেউ সতর্কতামূলক ওই নামাজগুলি আদায় করে, তাহলে সেটা আরো ভালো।[123]

---

[120] মাজমু'উল ফাতওয়া, ২৮/৬৩৫।

[121] https://tinyurl.com/2efuara3

[122] সুনানে নাসাঈ: ৪০৯৩।

[123] https://tinyurl.com/3tmsk8v6

প্রশ্ন: যদি বন্দী ব্যক্তির নিকট একটি মাত্র কাপড় থাকে আর তা নাপাক থাকে, তাহলে কিভাবে সালাত আদায় করবে?

উত্তর: যদি সালাত আদায়কারী ব্যক্তির কাপড়ের এক চতুর্থাংশ কেবল পাক থাকে এবং তার নিকট অন্য কোনো কাপড় না থাকে বা কাপড় পাক করার সুযোগ না থাকে তাহলে সে এই কাপড়েই নামাজ পড়বে। আর যদি এক চতুর্থাংশের কম অংশ পাক থাকে, তখনও জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে ওই নাপাক কাপড়েই নামাজ পড়বে। তবে এমন অবস্থায় হানাফী মাজহাবের ফতোয়া হল, তার ইচ্ছাধিকার থাকবে—সে চাইলে কাপড় খুলে (উলঙ্গ হয়ে) নামাজ পড়বে অথবা নাপাক কাপড়েই নামাজ পড়বে। তবে কাপড় পরে নামাজ পড়াই উত্তম।[124]

প্রশ্ন: বন্দিত্বের দরুন যদি কেউ যদি সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করতে না পারে, তাহলে কিভাবে সালাত আদায় করবে?

উত্তর: বন্দিত্বের দরুন ওয়াক্ত নির্ধারণ করতে না পারলে যথাসম্ভব গভীর চিন্তা-ভাবনা পূর্বক সময় নির্ধারণ করে নামাজ পড়বে।[125]

প্রশ্ন: কাউকে যদি কারাগারে নগ্ন অবস্থায় রাখা হয়, তাহলে সে কিভাবে সালাত আদায় করবে?

উত্তর: সালাত আদায়কারী ব্যক্তির যদি সতর ঢাকার মত কাপড়ও না থাকে, তাহলে সে বসে ইশারার মাধ্যমে রুকু, সেজদা করে সালাত আদায় করবে। তবে যদি দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে সালাত আদায় করে, তাহলেও তা আদায় হয়ে যাবে। তবে বসে আদায় করাই উত্তম।[126]

---

[124] বাদাঈ'য়ুস সানাঈ', ১/১১৭।

[125] আল-মাজমু' শরহুল মুহাযযাব, ৩/৭২।

[126] আল-হিদায়াহ ফি শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ১/৪৬।

শেষ কথা

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা বন্দী মুক্তির ফজিলত, বিধান, এ ব্যাপারে উদাসীনতার পরিণতি, উলামায়ে কেরামের বক্তব্যসহ প্রাসঙ্গিক সবকিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

এখন আমরা বন্দী মুক্তি সংশ্লিষ্ট আরেকটি জিনিস আলোচনা করব। তবে প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা উল্লেখ করি—

মুসলমানদের নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসুল এবং কুরআন ও দ্বীনে ইসলাম। তারা এসবের ব্যাপারে খুব সচেতন ও আপোষহীন। ফলে তারা যেভাবে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসুল, কুরআন এবং ইসলামকে ভালোবাসে ও সম্মান করে, সেভাবে এসবের শানে বেয়াদবি বা কটূক্তি কখনো সহ্য করতে পারে না, এমনকি প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না।

এগুলোর মধ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর একটি বিষয় হচ্ছে শাতিমে রাসুল (রাসুল ﷺ এর শানে কটূক্তি বা বেয়াদবিমূলক কথা বা কাজ) ইস্যু। ইসলাম ধর্ম এ ব্যাপারে খুব কঠোর, শাতিমে রাসুলের ব্যাপারে শরীয়াহ ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করেছে।

ইসলামে শাতিমে রাসুলের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে চার মাজহাবের ইমামগণ একমত।[127] এটি বাস্তবায়ন করবে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের অবর্তমানে কিংবা রাষ্ট্র বিদ্যামান থাকা সত্ত্বেও তাদের অবহেলার দরুন কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যদি রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয় অর্থাৎ শাতিমে রাসুল (রাসুলের অবমাননাকারী)-কে হত্যা করে, তাহলে তার কোনো অপরাধ হবে না। বরং সে এই কাজের জন্য বিরাট সওয়াব লাভ করবে। সে আল্লাহ তা'আলার নিকট মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হবে।

রাসুল ﷺ এর যুগে যেসমস্ত শাতিমে রাসুলকে হত্যা করা হয়, মুহাদ্দিসগণ সেগুলোর আলোচনা 'কিতাবুল মাগাজী' তথা যুদ্ধবিগ্রহের অধ্যায়ে এনেছেন। এখান থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে শাতিমে রাসুলকে হত্যাকারী মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রকৃত মুজাহিদের সওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ।[128]

২০১৩ সালের শুরুর দিকেই বাংলাদেশে প্রকাশ্যে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ, রাসুল ﷺ, উম্মাহাতুল মুমিনিনসহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ব্যাপারে বেয়াদবিমূলক মন্তব্য অনলাইনে প্রকাশিত হতে থাকে। ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক এবং রাসুলের অবমাননাকারী মুরতাদরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে ধুরু করে। রাষ্ট্রীয় মদদে কিংবা রাষ্ট্রের অবহেলায় ক্রমশ তা বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে আল্লাহর অনুগ্রহে আল্লাহর কিছু বান্দা সমস্ত উম্মাহর উপর ফরজ এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার নিয়তে স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের হত্যা করেন, জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। ফলে প্রচলিত ভঙ্গুর আইনে তারা দীর্ঘদিন থেকে জেলে বন্দী। কারো কারো ফাঁসির রায় হয়ে গিয়েছে।

আমাদের জন্য আফসোস! গোটা জাতির জন্য আফসোস! যেখানে সাধারণ মুসলমানই বিনা কারণে জেল-জুলুমের শিকার হলে আমাদের কর্তব্য হল তাদের

---

[127] হাশিয়াতু ইবনু আবিদিন: ৪/২৩৮। ইকফারুল মুলহিদিন লি আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি: ৬৪ পৃষ্ঠা।

[128] সহিহ বুখারী: ৪০৩৭, ৪০৩৯, ৪০৪০।

মুক্ত করার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। সেখানে শাতিমে রাসুলকে হত্যাকারী বীর, সাহাবায়ে কেরামের প্রকৃত অনুসারী এই সকল মুজাহিদ যুবক আজ দীর্ঘ এত বছর ধরে জেলে পচে মরতেছে, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, কোনো আক্ষেপ বা অনুশোচনাও নেই।

প্রিয় পাঠক! এই সকল মুজাহিদ যুবক আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেদের মহান কাজের দরুন সম্মানিত হবে, তাঁর জবাবদিহি থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছে কী জবাব দিব? কীভাবে আমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়াব?

আমাদের অপরাধ তো একটা না, একাধিক অপরাধ। আমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল, কুরআনের অবমাননার সময় নিশ্চুপ ছিলাম, কার্যকর কিছুই করি নি। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের অবমাননাকারীদের শায়েস্তা করল, তাদেরকেও আমরা জুলুম থেকে রক্ষা করি নি, তাদের সাহায্য করি নি। এমনকি উম্মাহকেও এই ব্যাপারে সতর্ক করি নি, যেভাবে সতর্ক করা প্রয়োজন।

হে আল্লাহ! আমি আমার জ্ঞান ও সক্ষমতা অনুযায়ী পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের ভাইয়েরা সাধ্যানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। আপনি আমাদের দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং কাপুরুষতা দূর করে দিন। আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের সাহায্য করুন। আপনার নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করার সক্ষমতা ও তাওফিক দান করুন। আমিন।